কিছুতে প্রাস্কোভিয়ার সাহস সঙ্কুচিত বা ব্যতিক্রান্ত হইল না। সর্ব্বশক্তিমান নিয়ন্তার উপর তাহার অটল বিশ্বাস। প্রাস্কোভিয়া পিতার কথা শ্রবণ করিয়া কহিল "আমি যে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় এই অনুমতিপত্র পাইয়াছি তাঁহারই ইচ্ছায় আমি সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারিব; একনিষ্ঠ আগ্রহ ও প্রাণগত যত্ন থাকিলে সকল কার্য্যে মানবের বিঘ্ন বিপত্তি অন্তর্হিত হইয়া যায়। ইচ্ছা থাকিলেই কার্য্যসিদ্ধির উপায় প্রাপ্ত হওয়া যায়।" ইহা শুনিয়া তাঁহারা উভয়ে ভয় ও দুর্ভাবনায় অভিভূত হইয়া যথোচিত বিনয় করিলেন, ভৎর্সনা করিলেন, দুঃখ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে অবলম্বিত অধ্যবসায় হইতে বিরত করিতে পারিলেন না। অবশেষে নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। অবিলম্বে পিটার্সবর্গাভিমুখে যাত্রা করিবার সময় নির্দ্দিষ্ট হইল।

নির্দ্দিষ্ট দিবসে উষাকালে সুকুমার অরুণপ্রভা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র প্রাস্কোভিয়া প্রস্থানোচিত বেশ পরিগ্রহ করিয়া কটিদেশে এক চর্ম্ম নির্ম্মিত মুদ্রাধার ধারণ পূর্ব্বক পিটার্সবর্গাভিমুখে যাইবার জন্য দণ্ডায়মান হইল। সাইবিরিয়ায় কাপ্তেন লুপুলফের ধনসম্পত্তি মধ্যে একমাত্র রৌপ্য মুদ্রা সম্বল ছিল। তিনি কন্যাকে তাহাই লইতে বলিলেন। প্রাস্কোভিয়া বলিল "পিতঃ আমি ইহা লইয়া কি করিব? ইহা আমার পাথেয়ের উপযোগী অর্থও নহে; বরং ইহা আপনার নিকট থাকিলে আপনাদিগের বিশেষ উপকার হইতে পারে।" পিতা বারংবার পীড়াপীড়ি করাতে প্রাস্কোভিয়া অবশেষে মুদ্রাটী গ্রহণ করিল। আর দুইটী নির্ব্বাসিত ব্যক্তি প্রাস্কোভিয়াকে আরও কিছু অর্থ সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু প্রাস্কোভিয়া তাহা লইতে সম্মত হইল না অধিকন্তু যাইবার কালে তাহাদিগের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিল "আমি যে কিছু রাজপ্রসাদ পাইব তাহা কেবল আমাদের প্রাপ্য নহে, আপনারা উহার অংশ পাইবার যোগ্য।" তদনন্তর বিদায়কালীন উপাসনাকার্য্য সমাধা হইলে কাপ্তেন লুপুলফ অশ্রুপূর্ণলোচনে কন্যাকে আলিঙ্গন করিলেন। কন্যা জানু পাতিয়া পিতার আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক পিটার্সবর্গাভিমুখে চলিতে লাগিল।

সাইবিরিয়া হইতে পিটার্সবর্গে যাইতে হইলে অনেক দুর্গমস্থান অতিক্রম করিতে হয়। ঐ দুই স্থানের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ প্রকাণ্ড মহীরুহ শোভিত সুবিস্তীর্ণ অরণ্য দ্বারা পরিবৃত। অরণ্যে মধ্যে মধ্যে কয়েকটী গ্রাম বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত আছে। সেই অরণ্য দুষ্প্রবেশ ও দুরতিক্রম বলিয়া তৎকাল পর্য্যন্ত তত্রত্য লোকের বোধ ও বিশ্বাস ছিল। বিশেষতঃ শীতকালে, ঐ প্রদেশ নিরন্তর তুষারে সমাচ্ছাদিত থাকে; রাত্রিকাল এরূপ অন্ধতমসে সমাবৃত হয় যে কোনও বস্তু সম্মুখে থাকিলেও লক্ষ্য করিতে পারা যায় না। ঈদৃশ প্রবল প্রতিবন্ধক সত্ত্বে অতি দুঃসাহসিক ব্যক্তিও সাহস করিয়া সেই কাননপথে সাইবিরিয়া হইতে পিটার্সবর্গ প্রস্থানে উদ্যত হইতে পারে না। কিন্তু সেই কন্যার পক্ষে সেই সমস্ত প্রতিবন্ধক প্রতিবন্ধক বলিয়াই গণনীয় নহে। সেই অষ্টাদশবর্ষীয়া রুষবালা রুষরাজ্যের প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য আজ একমাত্র রৌপ্যমুদ্রা পথের সম্বল করিয়া একাকিনী বিপুল বিস্তৃত অরণ্যপথে চলিতে লাগিল।

যে দুইটী নির্ব্বাসিত ব্যক্তি প্রাস্কোভিয়াকে অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন তাঁহারা প্রস্থানকালে ইশ্চিমগ্রামের সীমান্তমেধ্য প্রাস্কোভিয়ার পথপ্রদর্শক হইয়া চলিলেন। তাঁহারা ইশ্চিমের সীমান্ত অতিক্রম করিতে পারিতেন না। পথিমধ্যে কয়েকটী বালিকা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতেছিল। ঐ দুইব্যক্তি প্রাস্কোভিয়ার রক্ষার ভার ঐ বালিকাদলের হস্তে সমর্পণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। একবার কয়েকটী দুর্বিনীত যুবক মদিরাপানে অর্দ্ধোন্মত্ত হইয়া বালিকাদিগের প্রতি নানাপ্রকার উৎপাত করিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল। বালিকাদল কেহই তাহাদিগের ভ্রুকুটীপাতে দৃকপাত করিল না। এইরূপে তাহারা সেই দুঃশীল যুবকদিগের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া দিবাবসানে এক গ্রামে উপস্থিত হইল। প্রাস্কোভিয়া তথায় জনৈক পরিচিত ব্যক্তির আলয়ে আতিথ্য স্বীকার করিয়া রজনী যাপন করিল। পরদিবস প্রভাত হইবামাত্র প্রাস্কোভিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পিটার্সবর্গাভিমুখে চলিল। ক্ষণকাল মধ্যে সেই গ্রাম অতিক্রম করিয়া প্রাস্কোভিয়া পুন-

রায় নিবিড় অরণ্য মধ্যে পড়িল। যাঁহারা ক্ষণকাল জন্য অপূর্ব্বপরিচিত বনমধ্যে ভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে এরূপ বনমধ্যে ক্ষণমধ্যে পথভ্রান্তি জন্মে। প্রাস্কোভিয়ার তাহাই ঘটিল। এইখানে প্রাস্কোভিয়া পথহারা হইয়া পড়িল। পূর্ব্বদিবসের পথভ্রমণ জন্য প্রাস্কোভিয়ার ক্লান্তি বোধ হইতে লাগিল এবং ভাবিল পথ অপরিজ্ঞাত, সমীপবর্ত্তী কোন গ্রামের নামও অবগত নহি, পথজ্ঞাপক কোন নিদর্শন নাই, যথেষ্ট পাথেয়ও নাই, এ বনমধ্য হইতে কি প্রকারে নিষ্ক্রান্ত হইব, কি প্রকারেই বা পথ চিনিয়া পিটাস বর্গে যাইব ইত্যাকার চিন্তা করিতে করিতে আশঙ্কায় অভিভূত হইতে লাগিল কিন্তু সাহসে বিসর্জ্জন দিল না। প্রাস্কোভিয়া এইরূপে কিয়ৎকাল চিন্তাকুলিত চিত্তে গমন করিতে করিতে সেই নিবিড় নিস্তব্ধ বনখণ্ডে তিনটী পথ ত্রিধা প্রসারিত দেখিতে পাইল। পথ দেখিয়া ভাবিল এ দিকে মনুষ্যবসতি আছে। ক্ষণপরে সেই পথত্রয়ের সম্মিলন স্থানে কয়েকটী পথিককে দেখিতে পাইল। পথিকেরা অবশ্য পথ জানে, জিজ্ঞাসিলে বলিয়া দিবেন এই ভাবিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে অগ্রসর হইল। রুষদেশে কীফ নামক এক নগর আছে। রুষদেশে সেই নগর হইতেই খ্রীষ্টধর্ম্মের আলোক প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। এ কারণ কীফ নগর তৎকালে এক পরম পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। প্রাস্কোভিয়া কেবল এই কীফ নগরের নাম অবগত ছিল। সুতরাং পথিকদিগকে সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয় কীফ নগরে যাইতে হইলে কোন পথ অবলম্বন করিতে হইবে? পথিকগণ প্রাস্কোভিয়ার কথায় উপহাস করিয়া চলিয়া গেল। প্রাস্কোভিয়া সেই অপরিজ্ঞাত পথত্রয়ের সম্মিলন স্থলে উপস্থিত হইয়া, অনন্যোপায় হইয়া মধ্যবর্ত্তী পথ অবলম্বন করিল। সৌভাগ্যক্রমে সেই পথই অভিলাষিত স্থলে যাইবার প্রকৃত পথ। প্রাস্কোভিয়া যে যে পথ অথবা গ্রামের মধ্য দিয়া গমন করিত তাহার নাম বলিতে পারিত না কিন্তু সেই সেই স্থানের এক একটী ঘটনা আপন স্মৃতিপটে বিশেষরূপে অঙ্কিত করিয়া রাখিত। প্রাস্কোভিয়া বলিত "আমি লক্ষপতির চিত্তচমৎকারী প্রাসাদ অপেক্ষা দরিদ্রের পর্ণকুটীরে অধিক সমাদর পাইয়াছি, আমি পর্য্যটনকালে বিভবশালীদিগের

গৃহে সুবাসিত ভোগ অপেক্ষা কৃষকের নিরুপকরণ আহারপানে অধিকতর তৃপ্তি বোধ করিয়াছি, দরিদ্রেরা দরিদ্রের প্রতি যেরূপ মমতা প্রদর্শন করিয়া থাকে ধনবানেরা কখনই সেরূপ করে না।” একবার সমস্ত দিবস পথভ্রমণ করিতে করিতে সন্ধ্যাগমে সহসা প্রবল ঝটিকা উপস্থিত হইল। প্রাস্কোভিয়া সমীপবর্ত্তী গৃহস্থের আলয়ে আশ্রয় লইবে এই স্থির করিয়া দ্রুতপদবিক্ষেপে চলিতে লাগিল; কিন্তু ঝটিকাবেগপ্রভাবে অধিক অগ্রসর হইতে পারিল না সুতরাং এক প্রকাণ্ড ভগ্নশাখ বৃক্ষের অন্তরালে আশ্রয় লইল। ঝটিকাবেগ না থামিতে থামিতে দিঙ্মণ্ডল অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হইল, আকাশমণ্ডলে মেঘমালা শ্রবণবিদারী গর্জ্জন করতঃ প্রভূত বারি বর্ষণ করিতে লাগিল। প্রাস্কোভিয়া তথা হইতে আর একপদও অগ্রসর হইতে পারিল না। অনশনে, সেই ভাবেই সেই বৃক্ষান্তরালে রজনীর অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত করিল; সমস্ত রাত্রি একবারও নয়ন মুদ্রিত করিতে পারিল না। রজনী অবসন্না হইলে সেই নিঃসহায়া বালিকা বারিধারা পরিষিক্ত হইয়া কর্দ্দমাক্ত পরিচ্ছদে দুর্ব্বহ দেহভার বহনপূর্ব্বক আবার পথপর্য্যটন আরম্ভ করিল। সেই সময়ে একজন ঋজুস্বভাব কৃষক যানারোহণে গ্রামান্তরে গমন করিতেছিল। প্রাস্কোভিয়ার দুরবস্থা দেখিয়া কৃষকের হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। কৃষক আপন শকটে প্রাস্কো-ভিয়াকে তুলিয়া লইয়া বেলা আট ঘটিকার সময় গ্রামের মধ্যে পঁহুছিয়া দিল। সে দিবস শীতাধিক্যবশতঃ তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্পন্দহীন হইয়া গিয়াছিল, ক্ষুৎপিপাসা নিবন্ধন দুর্ব্বলতা বশতঃ শকট হইতে অবতরণকালে পদে পদে প্রাস্কোভিয়ার পদস্খলন হইতে লাগিল। প্রাস্কোভিয়া শকট হইতে অবতরণ করিয়া সেই গ্রামের পারিপাট্যশালী গৃহাবলী অবলোকন করিয়া মনে মনে আশঙ্কিত হইতে লাগিল। ক্রমে দুই একপদ করিয়া অগ্রসর হইয়া এক গৃহের উন্মুক্ত গবাক্ষের নিকট দণ্ডায়মান হইল, ক্ষণ-পরেই গৃহস্বামিনীকে দেখিয়া বিনীত বচনে কহিল, “মহাশয়া আমি নিরা-শ্রয়া, শীতাতিশয্য বশতঃ অশেষবিধ কষ্ট পাইতেছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে আশ্রয় দিয়া এবং শীতার্ত্তদেহকে উত্তপ্ত করিতে দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করুন।” গৃহস্বামিনী তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া উপহাস করতঃ

দূর করিয়া দিল। প্রাস্কোভিয়া তথা হইতে দূরীভূত হইয়া আবার এক গৃহস্থের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া আপনার আর্ত্তভাব ব্যক্ত করিল। গৃহস্বামিনী প্রাস্কোভিয়াকে দেখিয়া বলিল আমরা চোর অথবা অপূর্ব্ব পরিচিত ব্যক্তিকে আশ্রয় দিই না। প্রাস্কোভিয়া তখন বিষণ্ণবদনে অবসন্নগমনে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই এক দেবালয় নিরীক্ষণ করিল। তদ্দর্শনে তাহার অন্তঃকরণে সাহস ও উৎসাহের সঞ্চার হইল। দেবালয়ে পঁহুছিলে সকল শঙ্কা দূর হইবেক, তথা হইতে কেহ আর আমাকে দূর করিয়া দিতে পারিবেক না এই ভাবিয়া দেবালয়ের দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। দেবালয়ের বহির্দ্বারের কপাট তখন অবরুদ্ধ ছিল সুতরাং সেই দুরন্ত শীতে প্রাস্কোভিয়া দেবালয়ের দ্বারদেশে বসিয়াই কালাতিপাত করিতে লাগিল। প্রচণ্ড হিমপ্রভাবে শরীরের শোণিত সঞ্চালন বন্ধ হইয়া তাহার হস্তপদাদি স্ফীত হইতে লাগিল এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্রমে ক্রমে এরূপ নিস্পন্দ ও কঠিন হইয়া আসিতে লাগিল যে আর তাহার উঠিবার শক্তি রহিল না। বাস্তবিক সেই অনাবৃত স্থানে নিরাবরণে রাত্রি যাপন দ্বারা প্রাস্কোভিয়ার যে স্বাস্থ্যহানি হইয়াছিল তাহা হইতে এ জন্মে আর মুক্তিলাভ করিতে পারিল না। গ্রামের কয়েকটী দুর্ব্বিনীত যুবক মন্দিরের নিকট আসিয়া কেহবা প্রাস্কোভিয়াকে চোর বলিয়া উপহাস করিল কেহবা দুশ্চরিত্রা বলিয়া বিরক্ত করিতে লাগিল। প্রাস্কোভিয়া এই ভাবে শীতক্লিষ্ট দেহে ক্ষুধার্ত্ত প্রাণে দুই ঘণ্টাকাল কণ্ঠগত প্রাণ হইয়া রহিল বটে কিন্তু অন্তরে ভক্তিভাবে ঈশ্বরাপসনা করিয়া আপনার বলবৃদ্ধি করিতে লাগিল। স্থানীয় শাসনকর্ত্তা প্রাস্কোভিয়ার চরিত্র দোষ সম্ভাবনা করিয়া তাহাকে যদৃচ্ছাক্রমে যাইতে দিলেন না। কিন্তু সেই তরুণবয়স্কা বালিকা সম্রাটপ্রদত্ত অনুমতিপত্র দেখাইয়া এবং আপন বৃত্তান্ত সবিস্তার কথনান্তর স্বকীয় বিশুদ্ধ স্বভাবের এরূপ অসংশয়িত নিদর্শন দেখাইল যে তিনি আর কোনরূপ আপত্তি না করিয়া প্রাস্কোভিয়াকে যাইতে অনুমতি দিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জনৈক কামিনী তথায় উপস্থিত হইয়া মৃদুমধুর বচনে প্রাস্কোভিয়ার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। সেই কামিনী সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মুক্তকণ্ঠে শত শত সাধুবাদ

প্রদান করতঃ পরম সমাদরে প্রাস্কোভিয়াকে আপন আলয়ে আশ্রয় দিলেন। প্রাস্কোভিয়া সেই রমণীর গৃহে কয়েকদিবস অতিবাহিত করিয়া পুনরায় পিটার্সবর্গাভিমুখে গমনাভিলাষে বহির্গত হইল। একে প্রবল শীত তাহাতে আবার দুর্ব্বল দেহ সুতরাং প্রাস্কোভিয়া পর্য্যটনকালে পথে দুই এক দিবস করিয়া কোন কোন লোকের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিত এবং আতিথ্য গ্রহণের পরিবর্ত্তে গৃহসম্মার্জ্জন বস্ত্রধৌতকরণ ইত্যাদি সামান্য সামান্য কার্য্য করিয়া গৃহস্বামীর প্রত্যুপকার সাধন করিত। প্রাস্কোভিয়া যেখানে আতিথ্য স্বীকার করিত সেখানে প্রথমেই আপন বৃত্তান্ত বর্ণন করিত না। কোন গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রাস্কোভিয়া সর্ব্বাগ্রেই কিঞ্চিৎ আহার সামগ্রী ও পানীয় ভিক্ষা চাহিত, পরে ক্ষুন্নিবৃত্তি ও পিপাসা শান্তি হইলে গৃহস্বামীকে আপন দুঃসহক্লান্তির কথা জ্ঞাপন করিয়া বিশ্রামার্থ স্থানলাভের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিত এবং তদ্বিষয়ে মনোরথ সম্পন্ন হইলে ও গৃহস্বামীর নিকট কথঞ্চিৎ পরিচিত হইলে অবশেষে আপন বৃত্তান্ত সবিশেষ বর্ণন করিত।

একদা একগ্রামের মধ্যে প্রায় সকল গৃহস্থই প্রাস্কোভিয়াকে আশ্রয় দিতে অসম্মত হইল। অবশেষে সন্ধ্যাগমে প্রাস্কোভিয়া নিরাশপ্রাণে এক বৃদ্ধের গৃহদ্বারে উপনীত হইল। বৃদ্ধের ভীষণমূর্ত্তি, তাহার গৃহিণীর মূর্ত্তি ততোধিক ভীষণ এবং তাহার গৃহও তদনুরূপ কুৎসিত। বৃদ্ধ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া প্রাস্কোভিয়াকে কর্কশবচনে দূর করিয়া দিয়াই আবার ডাকিয়া আনিয়া আশ্রয় দিল। প্রাস্কোভিয়া অনন্যোপায় হইয়া সেই গৃহেই রাত্রি যাপন করিল। প্রাস্কোভিয়া গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র গৃহিণী গৃহদ্বার দৃঢ়রূপে অর্গলবদ্ধ করিল। প্রাস্কোভিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, গৃহের মধ্যস্থলে অগ্নিকুণ্ডে একখণ্ড কাষ্ঠ জ্বলিতেছে এবং একপার্শ্বে এক নির্ব্বাণোন্মুখ দীপাধার দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই সেই ভীমমূর্ত্তি বৃদ্ধ গৃহের অপরপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া তীব্র কটাক্ষপাত সহকারে প্রাস্কোভিয়াকে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?" প্রাস্কোভিয়া কহিল "আমি ইশ্চিম হইতে আসিতেছি, পিটার্সবর্গে যাইব।" তখন বৃদ্ধ কহিল "তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার নিকট প্রচুর অর্থ আছে।"

প্রাস্কোভিয়া ভয়স্খলিত বচনে বলিল "আমার নিকট অতি সামান্য অর্থই আছে। তখন গৃহিণী সহসা সরোষ নয়নে উদ্ধত বচনে কহিল "তুই মিথ্যা কহিতেছিস্, এরূপ দূরদেশে আসিতে হইলে লোকে অর্থ বিনা কোন মতে গৃহের বাহির হয় না। প্রাস্কোভিয়া তাহাদিগকে অশেষ প্রকারে বুঝাইতে লাগিল কিন্তু তাহার সকল প্রয়াস বিফল হইল, তাহারা তাহার কথায় কিছুতেই বিশ্বাস করিল না। তখন প্রাস্কোভিয়া ভয়ে ম্রিয়মান হইয়া রহিল। অবশেষে তাহারা তাহাকে কিঞ্চিৎ .আহার সামগ্রী ও শয়নার্থ একখানি পশুচর্ম্ম প্রদান করিয়া অগ্নিকুণ্ডের নিকট প্রাস্কোভিয়ার শয়ন স্থান নির্দ্দিষ্ট করিল। প্রাস্কোভিয়া ভাবিল ইহারা দস্যু, অর্থ লোলুপ হইয়া আমার প্রাণ বিনাশ করিতে পারে; এক্ষণে উত্তম কল্প এই ইহাদের সমক্ষে আমার যাহা কিছু সম্বল আছে বাহির করিয়া দিই বলিয়া আপন মুদ্রাধার এবং অন্যান্য যাহা কিছু ছিল একপার্শ্বে রাখিয়া তৎকালোচিত উপাসনা কার্য্য সমাধা করিয়া শয়ন করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে গৃহিণী প্রাস্কোভিয়াকে নিদ্রিত বোধ করিয়া স্বামীকে কহিল "নিশ্চয়ই উহার অনেক অর্থ আছে, আমি উহার কটিদেশে এক মুদ্রাধার দেখিয়াছি" এই বলিয়া ক্রমে ক্রমে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে অগ্নিকুণ্ডের সন্নিহিত হইয়া মুদ্রাধার ছিন্ন করতঃ অর্থ নিষ্কাশন করিবার উদ্যোগ করিল। উহাদিগের বিকটাকার ও বিভৎস বেশে দর্শনে প্রাস্কোভিয়ার অন্তঃকরণে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইল। ইহারা প্রাণ বিনাশের মন্ত্রণা করিয়াছে এই সিদ্ধান্ত করিয়া অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণলোচনে কাতর বচনে কহিতে লাগিল "তোমাদের নিকট আমার প্রার্থনা এই, আমার প্রাণ হিংসা করিও না, আমার প্রাণদান কর।" এই বলিয়া প্রাস্কোভিয়া জীবন ভিক্ষা চাহিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল "আমার কাছে আর কিছুই নাই।" তাহারা মুদ্রাধার মধ্যে সম্রাটের লিখিত অনুমতিপত্র এবং একটী মাত্র রৌপ্যমুদ্রা আছে দেখিয়া, আরও অর্থ অন্য কোন স্থানে লুকায়িত আছে কিনা জানিবার জন্য প্রাস্কোভিয়ার গাত্রে হস্তাবর্ত্তন করতঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্পর্শ করিয়া দেখিতে লাগিল। তাহারা প্রাস্কোভিয়ার নিকট আর কিছু না পাইয়া প্রাস্কোভিয়াকে পরিত্যাগপূর্ব্বক শয়ন করিতে গেল।

ক্ষণপরেই তাহাদিগের নাসিকাধ্বনি হইতে লাগিল। প্রাস্কোভিয়াও প্রাণভয়ে অভিভূত ও কাতর হইয়া কম্পিত কলেবরে শয়ন করিয়া রহিল এবং ক্লান্তিবশতঃ সত্বর নিদ্রাভিভূত হইল। প্রভাত হইবামাত্র প্রাস্কোভিয়া চর্ম্মশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলে তাহারা প্রাস্কোভিয়ার প্রতি কথঞ্চিৎ সদয় ব্যবহার করিল। তাহারা প্রাতঃকালে প্রাস্কো-ভিয়াকে কিঞ্চিৎ আহারাদি দিয়া পরে নানা প্রকার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। প্রাস্কোভিয়া তদুত্তরে তাহাদিগের নিকট আপন বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। তাহারা প্রাস্কোভিয়ার সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ক্ষণকাল মুগ্ধ হইয়া রহিল; পরে কহিল "অর্থ লালসার বশীভূত হইয়া তোমার প্রতি অত্যাচার করা আমাদের অভিসন্ধি নহে; তোমার অনিষ্ট চেষ্টা একক্ষণের জন্য আমাদিগের অন্তঃকরণে উদিত হয় নাই; তুমি হয়তো অসদভি-প্রায়ে এখানে আসিয়াছ আমরা এই সন্দেহ করিয়াছিলাম। এই সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত আমরা তোমার গাত্রস্পর্শ করিয়া দেখিতেছিলাম যে তোমার নিকট কোন প্রকার অস্ত্র শস্ত্র লুক্কায়িত আছে কিনা। আমরা তোমার মনের ভাব পরীক্ষার্থ ছলনা করিতেছিলাম; বস্তুতঃ আমরা দস্যু তস্কর নহি।" প্রাস্কোভিয়া আহারানন্তর তাহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। বিদায়কালে তাহারা প্রাস্কোভিয়ার হস্তে কতিপয় মুদ্রাপ্রদান করিল। কিন্তু তাহাদিগের দুষ্টাভিসন্ধি সম্বন্ধে প্রাস্কোভিয়ার অণুমাত্র সংশয় রহিল না।

এইরূপে পাপাশয়দিগের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া প্রাস্কোভিয়া আবার পরিভ্রমণে বহির্গত হইল। এক দিবস একগ্রামের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে কয়েকটী কুক্কুর চীৎকার ধ্বনি করিয়া প্রাস্কোভিয়ার পশ্চাৎ ধাব-মান হইল। প্রাস্কোভিয়া যষ্টির দ্বারা কুক্কুরপালকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু কুক্কুরেরা তদ্দর্শনে রোষবশতঃ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রচণ্ড-মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক তাহাকে দংশন করিতে গেল এবং তাহার অঙ্গবস্ত্র ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল। পরে একজন কৃষক আসিয়া কুক্কুরদিগকে তাড়াইয়া দিল।

ক্রমে শীতকাল আসিল। সপ্তাহকাল ব্যাপিয়া অনবরত তুষারবৃষ্টি হইয়া দিঙ্মণ্ডল এরূপ তুষারমণ্ডিত মেঘমালায় ও ভূমিতল নিবিড় অন্ধকারে সমা-চ্ছন্ন হইল যে পথ স্থির করা দুর্ঘট হইয়া উঠিল। ঈদৃশ প্রবল প্রতিবন্ধক

সত্ত্বে অতি দুঃসাহসিক ব্যক্তিও সাহস করিয়া একাকী পদব্রজে পিটার্স-বর্গ প্রস্থানে উদ্যত হইতে পারে না। সুতরাং তত্রত্য কৃষকেরা প্রাস্কো-ভিয়াকে তথায় কিয়দ্দিবস অবস্থান করিতে অনুরোধ করিল। ক্রমে ক্রমে তুষার এত অধিক পরিমাণে বৃষ্ট হইতে লাগিল যে রাস্তা বাসগৃহ ও বৃক্ষাদি একেবারে তুষারময় হইয়া শুভ্রবর্ণ ধারণ করিল। কয়েক দিবস মধ্যেই সেই প্রদেশের নদী সরোবরাদি জমিয়া প্রস্তরবৎ কঠিন তুষারপ্রান্তরে পরিণত হইল। সেই কঠিন তুষারপ্রান্তর এরূপ মসৃণ যে রুষগণ একপ্রকার চক্রবিহীন শকটে বলগাহরিণ সংযোজন পূর্ব্বক তুষারপ্রান্তরের উপর দিয়া অতি দ্রুত গমনাগমন করে। এইরূপ চক্রবিহীন শকটকে রুষেরা স্লেজ কহিয়া থাকে। তৎকালে কয়েকটী স্লেজ সেই গ্রাম হইতে একাথেরিনেন-বর্গ নামক স্থানে যাইবার জন্য প্রস্তুত ছিল। স্লেজচালকগণ প্রাস্কোভিয়ার বিবরণ শ্রবণ করিয়া তাহাকে বিনাব্যয়ে একাথেরিনেনবর্গ পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে প্রতিশ্রুত হইল। কিন্তু প্রাস্কোভিয়ার হিম নিবারণোপযোগী গাত্রাবরণ ছিল না। রুষগণ সদাসর্ব্বদা পশম নির্ম্মিত একপ্রকার অঙ্গরক্ষনী ব্যবহার করে এবং শীতকালে আর একপ্রস্থ চর্ম্ম পরিচ্ছদ উহার ভিতর পরিধান করিয়া থাকে। শেষোক্ত পরিচ্ছদের পশম গাত্রের উপর থাকায় শরীর উষ্ণ থাকে। রুষগণ এই সমস্ত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সর্ব্বোপরি এক দীর্ঘ বহির্বাস ব্যবহার করিয়া থাকে। একে হিমনিকেতন রুষভূমি, তাহাতে ভয়ানক শীতকাল, তাহাতে আবার দুরন্ত শীত নিবারণ জন্য গাত্রবস্ত্র নাই। তথাপি প্রাস্কোভিয়া সেই হিমময় প্রদেশে নিরাবরণে স্লেজ আরোহণ পূর্ব্বক চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে তুষার শীতল বায়ু-সংস্পর্শে প্রাস্কোভিয়ার মজ্জার ভিতর ছুরিকা বিদ্ধ হইতে লাগিল। দারুণ শীতে তাহার শোণিত যেন বরফের মত জমাট বাঁধিয়া আসিতে লাগিল দুর্ব্বহ শীতপ্রভাবে তাহার সর্ব্বশরীর নিস্পন্দ হইয়া যাইতে লাগিল। চালকগণ দেখিল এই ভাবে আর কিয়ৎক্ষণ চলিলেই প্রাস্কোভিয়ার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তখন তাহারা প্রাস্কোভিয়াকে সন্নিহিত এক পান্থনিবাসে অবতরণ করাইয়া দিতে স্থির করিল। সেই পান্থনিবাসের অধিকারী প্রাস্কোভিয়াকে এরূপ অবস্থায় আশ্রয় দিতে সম্মত হইল না। সঙ্গীগণ

বিজনে আমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে এই আশঙ্কায় নিরাশ্রয়া প্রাস্কোভিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তাহার হৃদয়ভেদী রোদন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া চালকেরা শকটচালনা বন্ধ করিয়া এই স্থির করিল যে আমরা পরস্পরের মধ্যে অর্থ সংগ্রহ করিয়া প্রাস্কোভিয়াকে একখানি মেষচর্ম্ম নির্ম্মিত বহির্বাস ক্রয় করিয়া দিব। কিন্তু সেই মনুষ্য বসতি বিহীন স্থানে এরূপ বহির্বাস ক্রয় করিতে পাওয়া গেল না। অনন্তর তাহারা সেই পান্থনিবাসের অধিকারীকে কহিল "মহাশয় আপনি এই বালিকাকে স্বকীয় বহির্বাস বিক্রয় করুন, আমরা আপনাকে ইহার উচিতাধিক মূল্য দিতে প্রস্তুত আছি।" সেই বিজন প্রদেশে সহজে শীতোপযোগী গাত্রাবরণ পাওয়া যায় না সুতরাং অধিকারী আপনার বহির্বাস প্রাস্কোভিয়াকে বিক্রয় করিতে পারিল না। আর ক্ষণকাল নিরাবরণে এই ভাবে অবস্থিতি করিলেই প্রাস্কোভিয়ার প্রাণবায়ুর অবসান হইবে দেখিয়া চালকেরা সত্বর কোন উপায় উদ্ভাবন করা আবশ্যক বিবেচনা করিল। একজন দয়ার্দ্র-হৃদয় শকটচালক অতিমাত্র ব্যগ্রতা সহকারে অন্যান্য চালকদিগকে কহিল আমি আমার বহির্বাস প্রাস্কোভিয়াকে দিব এবং যখন আমার হিম ক্লেশ অসহ্য হইয়া উঠিবে তখন তোমরা মধ্যে মধ্যে তোমাদিগের গাত্রাবরণ আমাকে দিয়া আমার হিমাঙ্গকে উত্তপ্ত করিতে দিও। এই প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইল। তাহারা সেই শকটচালকের মেষচর্ম্ম নির্ম্মিত বহির্বাসে প্রাস্কোভিয়ার দেহ আবৃত করিয়া পুনরায় শকটচালনা করিল। সেই করুণ হৃদয় শকটচালক হিমক্লেশ লাঘবের জন্য উচ্চকণ্ঠে গান গাহিতে গাহিতে তুষার-শীতলবায়ুপ্রবাহ ভেদ করিয়া চলিতে লাগিল আর অন্যান্য চালকগণ মধ্যে মধ্যে স্ব স্ব গাত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া তাহাকে দিয়া তাহার হিমাঙ্গকে উত্তপ্ত করিতে লাগিল। গাত্রাবরণ উন্মোচনকালে প্রতিবারই শকটচালকেরা এক প্রকার আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল আর প্রাস্কোভিয়া নীরবে তাহাদিগের মঙ্গল কামনায় জগদীশ্বরের আরাধনা করিতে করিতে চলিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকমলকৃষ্ণ সাহা।

স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে অবলম্বনীয় পন্থা।

আমি এতদূর যাহা বলিয়া আসিয়াছি, নব্যসম্প্রদায়ের পাঠক তাহা অবধানের সহিত আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন, আশা করা যায়, যে রমণীর মাতৃত্ব অপেক্ষা উচ্চ অধিকার এবং মাতৃত্ব হইতে শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার অন্য কোথায়ও দৃষ্টিগোচর হয় না। আমি ইহাও বলিয়া আসিয়াছি যে মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা একদিকে গৃহকর্ম্মের ব্যবস্থা, অপরদিকে বিদ্যাশিক্ষারও দৃষ্টান্ত ও বিধানের দ্বারা সেই মাতৃত্বই বিকশিত করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। বঙ্গবাসী হিন্দুকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব; অর্থাৎ এক সম্প্রদায় কার্য্যত তন্ত্রবাক্য এবং অপর সম্প্রদায় ভাগবত প্রভৃতি পুরাণবাক্য সর্ব্বাপেক্ষা মান্য ও প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন। "শাস্ত্রে রমণীর উচ্চশিক্ষা" প্রবন্ধে ইহাও সবিস্তারে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, তন্ত্রশ্রেষ্ঠ মহানির্ব্বাণতন্ত্রও কন্যাকে গৃহকর্ম্ম ও বিদ্যাশিক্ষা প্রভৃতি সকল বিষয়ে পুত্রের সহিত সমভাবে শিক্ষা দিবার উপদেশ দিতেছেন; অপরদিকে স্ত্রীলোক প্রভৃতির শিক্ষার অভাব দেখিয়া বিদীর্ণহৃদয় ভাগবতকার স্ত্রীশূদ্রাদির জন্যই ক্ষুৎপিপাসার শান্তিদায়ক নিগমকল্পতরুর সেই অমৃতফল আহরণ করিলেন। আমাদের পুত্রকন্যাকে সমভাবে শিক্ষা দিবার উপদেশ পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের মহামহোপাধ্যায় জনষ্টুয়ার্টমিল প্রভৃতির নিকট গ্রহণ করিবার জন্য ধাবিত হইতে হইবে না—আমরা ঋষিদিগেরই উপদেশে তাহা প্রাপ্ত হইব। প্রভেদের মধ্যে দেখিতে পাই যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা কেন্দ্রভূমি অবলম্বন করিতে না পারিয়া পরিধির চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইয়াছেন, কিন্তু আমাদের ঋষিমুনিগণ মাতৃত্বের কেন্দ্রস্থানে দণ্ডায়মান হওয়াতে তাঁহাদের উপদেশের গাম্ভীর্য্য অতলস্পর্শ। তাঁহাদের মতে এই মাতৃত্বকে নিষ্কলঙ্কভাবে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই অবরোধপ্রথাকে (মুসলমানের ঘেরাটোপের অনুসূচক জেনানা প্রথাকে নহে) সম্পূর্ণ নির্ব্বাসিত না করিয়া যথাযথরূপে

রক্ষা করা কর্ত্তব্য এবং তাঁহাদের মতে জ্ঞানার্জ্জনের অধিকার হইতে স্ত্রীলোকদিগকে বঞ্চিত করিতে কাহারই অধিকার নাই। এইরূপে দেখিতেছি যে আমাদের শাস্ত্রবিধির অতিরিক্ত এবং প্রকৃতই অতিরিক্ত স্বাধীনতা ও মাতৃত্বাতিগ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া নব্যসম্প্রদায় পরিণামদর্শীর কার্য্য করিতেছেন না এবং প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা দিতে ইচ্ছা করিলে তাহার প্রয়োজনও নাই।

তাই বলিয়া রক্ষণশীল সম্প্রদায়, বিশেষত বঙ্গদেশে আজকাল যে ভাবে অবরোধপ্রথা রক্ষা করিবার এবং স্ত্রীকন্যাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা না দিয়া নিরক্ষর রাখিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা যে মাতৃত্ববিকাশের কোনমতেই উপযোগী নহে, প্রত্যুত অন্তরায় উপস্থিত করে এবং সুতরাং তাহা যে কখনই অনুমোদনীয় হইতে পারে না, একথা আমি বারম্বার উল্লেখ করিতে করিতে ভগ্নকণ্ঠ হইয়া পড়িয়াছি। আজকালকার কঠোর অবরোধপ্রথা মুসলমানদিগের অত্যাচারের ভয়ে তাহাদেরই নিকট হইতে ধার করিয়া লওয়া হইয়াছে এবং ইহার সুদ গণিতে গণিতে আমরা মৃতকল্প হইয়া পড়িতেছি। কোরাণের অনুমোদিত না হইলেও মুসলমানদিগের অসংখ্য কামিনীর সহিত সহজে "নিকা" করিবার প্রচলিত প্রথা এবং ভারতাক্রমণের পর অবধি তাহাদিগের বিলাসিতা বৃদ্ধি এবং আমাদিগের দুর্ব্বলতা ও অনুকরণপ্রিয়তা, এই সকল মিলিত হইয়া দুর্নীতির অনুবোধক এই মুসলমানী কঠোর জেনানাপ্রথা আনয়ন করিয়াছে। মুসলমানী প্রভাব অনুভব করিবার পূর্ব্বে হিন্দুরা পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ দেখিতে দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা বাল্যাবধি শিক্ষালাভ করিতেন; তখন তাঁহাদের মধ্যে রমণীর সতীত্বের কিরূপ আদর ছিল, তাহা বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া লিপিবদ্ধ পূর্ব্বক জগতের সমক্ষে এক মহান্ আদর্শ রক্ষা করিয়াছেন এবং হিন্দুরমণীরাও সময়ে সময়ে আবশ্যক হইলে ভীষণ জহরব্রতের উদ্‌যাপন করিয়া সতীত্বের মাহাত্ম্য দিগ্‌দিগন্তে বিঘোষিত করিয়াছেন।

এই জহরব্রত দুর্ব্বল বঙ্গদেশের বলপূর্ব্বক সতীদাহ নহে, ইহা বলবান্ পাশ্চাত্য ভারতের রমণীগণের সতীত্ব রক্ষার জন্য স্বেচ্ছায় অগ্নিতে জীবনাহুতি। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সতীত্ব রক্ষার জন্য জীবন সমর্পণ, দলে

দলে ও মিলিতভাবে অগ্নিতে স্বেচ্ছায় আত্মদান—ভারতের এই এক অপূর্ব্ব চিত্র; জগতের ইতিহাসে এরূপ চিত্র অতীব বিরল। পূজনীয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রণীত "সরোজিনী" নাটকে ইহার একটী সুন্দর চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। সকলেই জানেন যে আল্লাউদ্দীন এক সুন্দরী রাজপুত মহিলাকে হস্তগত করিবার জন্য চিতোরজয়ে উদ্যক্ত হন। অবশেষে যখন তিনি চিতোর জয় করিলেন, তখন রাজপূত মহিলারা দলে দলে অগ্নিকুণ্ডে দেহত্যাগ করিতে লাগিলেন। প্রথমেই রাজমহিষী পদ্মিনী, যাঁহার উদ্দেশ্যে আল্লাউদ্দীনের চিতোরাভিযান প্রস্তুত হইয়াছিল, তিনিই দেহত্যাগ করিলেন। আল্লাউদ্দীন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজকুমারী সরোজিনীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া নানা প্রলোভন দেখাইয়াও যখন হস্তগত করিতে পারিলেন না, তখন বলপ্রকাশে উদ্যত হইয়া বলিতেছেন—"আমি বলপ্রকাশ কল্লে কে এখানে তোমাকে রক্ষা করে? এখানে কে তোমার সহায় আছে?

"সরো। জানিস্ নরাধম, অসহায়া রাজপুত মহিলার ধর্ম্মই একমাত্র সহায়।

"আল্লা। তবে আর অধিক কথায় প্রয়োজন নাই। অনুনয় মিনতি দেখ্‌ছি তোমার কাছে নিষ্ফল। এইবার দেখ্‌ব, কে তোমায় রক্ষা করে, দেখ্‌ব কে তোমার সহায় হয়! (ধরিতে অগ্রসর)

"সরো। এই দেখ্ নরাধম! আমার সহায় কে? (অগ্নিকুণ্ডে পতন)।"

রাজপুত মহিলারা আপনাদিগের সতীত্ব যেরূপ আপনারা রক্ষা করিতেন, সেইরূপ আমাদিগের পুরমহিলারা যদি উপযুক্ত স্বাধীনতা লাভ করিয়া আপনাদিগের সতীত্ব আপনারা রক্ষা করিতে পারেন, তাহা কি অল্প সুখের বিষয়? তাহাতেই সতীত্ব রক্ষার প্রকৃত মর্য্যাদা। আর, স্ত্রীলোকেরা অন্তঃপুরে বলপূর্ব্বক আবদ্ধ থাকিলেই কি তাঁহাদিগের সতীত্ব স্থির থাকিবার নিশ্চয়তা আছে? তাহা যদি থাকিত, তবে আরব্য ও পারস্য উপন্যাস রচিত হইবার পক্ষে বিলক্ষণ সন্দেহ ছিল। মানুষের মন, স্ত্রীলোকেরই হউক বা পুরুষেরই হউক, কখনও চিন্তাহীন হইয়া থাকিতে পারে না। সৎবিষয়ে যদি চিন্তা করিবার সুবিধা না পাওয়া যায়, তবে

মানব নিশ্চয়ই অসৎবিষয়ের পশ্চাতে ধাবিত হইবে। আমার বিশ্বাস যে এই উভয়ের মধ্যে মধ্যপথ বলিয়া কিছু নাই। সুতরাং আমাদের দেশে স্ত্রীলোকেরা যদি সৎশিক্ষা না পায়, তাঁহাদিগকে যদি শিক্ষাহীনতার মধ্যে ডুবাইয়া রাখা হয়, তবে তাঁহারা যে গৃহবিবাদ, পরচর্চ্চা, অশ্লীল তামাসা প্রভৃতি নানা অসৎ বিষয়ে কালযাপন করিতে থাকিবেন, তাহা বলাই বাহুল্য। বিশেষত পূর্ব্বে হিন্দুরমণী ব্রতাদিতে যে শিক্ষালাভ করিতেন, আজকাল তাহাও উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই চলে। ক্রমে যখন তাঁহারা এইরূপে অসৎ বিষয় সমূহে অভ্যস্ত হইয়া যাইবেন, তখন প্রলোভনের বিষময় পথে তাঁহাদিগের পদার্পণ করিতে কতই বা বিলম্ব লাগিবে? জ্ঞানার্জ্জনে মনোযোগ প্রদান যে ইহার প্রতীকারক একটী মহৌষধ, তাহা বোধ হয় আজকাল শিক্ষিত যুবকবৃন্দকে বলিয়া দিতে হইবে না। স্ত্রীশিক্ষার অভাবে এবং কুসংস্কারের পরিপোষক কৌলীন্যের প্রভাবে যে দেশের কিরূপ দুর্গতি হইতে পারে, তাহা আজ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেনগুপ্ত তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "হিন্দুমহিলা" নাটকে সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেই ননদ ও বধূর কলহ, বধূর নিকটে শাশুড়ীর বাক্যবাণ দান প্রভৃতি বর্ত্তমানে সৎশিক্ষাপ্রাপ্ত পরিবারের মধ্যে কিঞ্চিৎ কমিয়া গেলেও সাধারণত যে সমান ভাবেই রহিয়াছে তাহা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি মাত্রেই দেখিতে পারেন। যে গৃহে উপযুক্ত স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা স্থান পাইয়াছে, তথায় যে এরূপ বিপদের সম্ভাবনা অল্প তদ্বিষয়ে কি প্রশ্নও উঠিতে পারে? এই দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম সমূহের প্রকৃতি যে অতি জঘন্য বিকৃতিলাভ করিয়াছে, এই রোগাতুর শোকাকুল বঙ্গদেশে যে প্রচলিত নেড়ানেড়ীর দল, গুরু-দাসীর দল প্রভৃতি নানা কদাচারী বামাচারী ভুঁইফোড় সম্প্রদায় উত্থিত হইয়া বদ্ধমূল হইতেছে, এবং রক্তশোষক বাদুড়ের ন্যায় মোহমুগ্ধ বঙ্গ-বাসীর রক্তে পরিপুষ্ট হইতেছে, উপযুক্ত স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার অভা-বই কি তাহার অন্যতম প্রধান কারণ নহে? উপযুক্ত শিক্ষা ও স্বাধীনতা থাকিলে মহিলারা নিজেদের বিবেচনা শক্তি পরিচালনা করিয়া কখনই নিজপদে কুঠারাঘাত করিতে দিতেন না, বামাচার প্রভৃতি এখানে প্রবেশ

লাভ করিতেই পারিত না। সৎবিষয়ক পুস্তক সকল যে শিক্ষা দিবার পক্ষে বিশেষ সহায় একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না, কিন্তু যদি গৃহকর্ত্তা আপন স্ত্রীকন্যাদিগকে পুস্তক ব্যতীত অন্যবিধ নানা উপায়ে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা যে ভাল নহে, এ কথাও কেহ বলিতে পারিবেন না। আরও, বর্ত্তমানে ছেলেরা যে ভাবে শিক্ষিত হইতেছে, তাহাতে মেয়েদেরও শিক্ষিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। একটী ছেলে শিক্ষিত হওয়াতে তাহার হৃদয়মন নানাদিকে বিস্তৃত ও উন্নত হইল, এই অবস্থায় নিতান্ত অশিক্ষিতা বালিকার সহিত তাহার বিবাহ হইলে সে কি বিড়ম্বনা, তাহা মুখে বলিবার বিষয় নহে, কল্পনার বিষয়। সন্তানাদিকে শিক্ষিত পিতা সন্তানের হিতজনক উপদেশ যখন দিবেন, অশিক্ষিতা মাতা হয়তো তখন অজ্ঞান বশতঃ তাহার বিপরীত উপদেশ দিতে থাকিবেন; কেবল তাহাই নহে, তাহারা পরস্পর পরস্পরের হৃদয়ের ভাব বুঝিতেও পারে না এবং পরস্পরের নিকট সুব্যক্তও করিতে পারে না। এই সকল কারণে আপনার হৃদয়ে নবোত্থিত প্রেমের প্রতিচ্ছায়া দেখিতে পাইবে বলিয়া যে কত গৃহের মোহপ্রাপ্ত সন্তান বারবনিতার চরণে আত্মাদেহমন জলাঞ্জলি দিয়াছে এবং কত শত কুলবধূ স্বামীর প্রেমলাভে বঞ্চিত হইয়া সেই একই কারণে অপরের নিকটে আত্মবিক্রয় করিয়া পরিণামে পশু অপেক্ষা হেয় হইয়া পড়িয়াছে। এই বিষয় ভাবিতে গেলে মস্তক বিঘূর্ণিত এবং হৃদয় যন্ত্রপেষিতের ন্যায় বোধ হয়। দুঃখে বিদীর্ণ হৃদয়ে এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি যে, বাল্যবিবাহ, কঠোর অবরোধ, উপযুক্ত স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার অভাব যতদিন না এ দেশ হইতে চলিয়া যাইতেছে, ততদিন এ দেশের অদৃষ্টে মঙ্গলের সম্ভাবনা অতি অল্প।

প্রাচীন-পক্ষপাতী সেকেলে লোকদিগের অবলম্বিত স্ত্রীলোকদিগকে নিরক্ষর রাখিবার প্রথা এবং মুসলমানদিগের নিকটে ধার লওয়া কঠোর জেনানাপ্রথা মাতৃত্ব পরিস্ফুট করিবার পথে যেমন গুরুতর বিঘ্ন আনয়ন করে দেখিয়া আসিলাম, সেইরূপ ইহাও বলিয়া আসিয়াছি যে নব্যসম্প্রদায়ের পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থা মাতৃত্ব অতিক্রম করিয়া গুরুতর অমঙ্গল

আনয়ন করিতে পারে। তাই বলিয়া যে ইহার উপকারিতা একেবারেই নাই তাহা নহে। মঙ্গলময় ভগবানের রাজ্যে মঙ্গলের সম্পর্ক রহিত পদার্থ বা ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। ভগবান মঙ্গলজনক ঘটনাকে সংসারে প্রেরণ করেন, আমরা তাহার অপব্যবহার বা অতিব্যবহার করিয়া অমঙ্গলের সূচনা করি। কামক্রোধ প্রভৃতি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকা যে মন্দ তাহা নহে, তাহার অপব্যবহারই জগত সংসারে অমঙ্গল আনয়ন করিয়া মঙ্গলের নূতন অবতরণ পথ রচনা করে। স্ত্রীশিক্ষা মন্দ, এই কথা যে নিতান্ত অযৌক্তিক, তাহা বোধ হয় এখন আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই স্ত্রীশিক্ষার অপব্যবহার যে কুফল আনয়ন করে, তাহা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। স্ত্রীশিক্ষার ন্যায় স্ত্রীস্বাধীনতারও সামঞ্জস্যের সহিত ব্যবহার অমঙ্গলের কারণ নহে, তাহার অপব্যবহারই প্রভূত অমঙ্গলের নিদান। নব্যবঙ্গের কুলললনাদিগের শিক্ষা ও স্বাধীনতার বিশেষ অপ্রয়োজন হইয়া যে অমঙ্গল আনয়ন করিতেছে, তাহা আমরা প্রায় সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছি এবং নিতান্ত মর্ম্মাহত হৃদয়েই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করা হইয়াছে। জ্বর প্রভৃতি রোগকে গ্রাহ্য না করিয়া অত্যাচারের মাত্রা বাড়াইলে শীঘ্রই তাহা ক্ষয়রোগে পরিণত হইয়া রোগীর প্রাণবিনাশে উদ্যত হয় এবং বিচক্ষণ কোমল হৃদয় চিকিৎসকও উপযুক্ত সময়ে রোগীকে তাহার মানসিক কষ্টের সম্ভাবনা সত্ত্বেও রোগের কথা জানাইতে বাধ্য হয়েন। বর্ত্তমানে আমাদের বঙ্গসমাজে অস্বাভাবিক স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার কারণে যে রোগ দাঁড়াইবার উপক্রম করিতেছে এবং সমাজের সর্ব্বনাশসাধনে উদ্যুক্ত রহিয়াছে, এ সময়ে সমাজহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই এই রোগের বিষয় স্পষ্ট কথায় সর্ব্বসাধারণে জানাইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। আমি সমাজ-চিকিৎসকও নহি অথবা আমার দুই চারিটী সামান্য কথা যে সাধারণের গ্রাহ্য হইবে, তাহারও আশা করি না। তবে আমার আশা এই যে, আমি হিতৈষণাপ্রেরিত হইয়া সমাজের মঙ্গলের পথ অন্বেষণ করিতে করিতে যে পথ প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই পথ আমাদিগের অপেক্ষা বহুল জ্ঞানবান্ মহাপুরুষ মুনি-

ঋষিদিগের প্রদর্শিত এবং বহুসহস্র বৎসরের পরীক্ষিত এবং তদুপরি এই জ্ঞানোজ্জ্বল শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান বঙ্গবাসীর ন্যায় উন্নত ও সভ্য (!) মানবেরও হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছে। সুতরাং এই মঙ্গল পথ অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিতে ভারতবাসী হিন্দুমাত্রেই বাধ্য, তাহা বলা বাহুল্য। আমি কিন্তু হিন্দুদিগের অতিরিক্ত, ভারতবাসীর অতিরিক্ত সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের, সমগ্র জগতের লোককে আহ্বান করিয়া বলিতেছি যে "হে জগতবাসী মানবগণ! তোমরা সকলে বহুসহস্র বৎসরের অগ্নিপরীক্ষায় পরীক্ষিত এই মঙ্গলের পথ অবলম্বন করিয়া দেখ—জগতের ইতিহাসে এক অপূর্ব্ব নবতর পৃষ্ঠা উদ্ঘাটিত হইবে।" ভারতের হিন্দুর যেটুকু অধঃপতন হইয়াছে, তাহা নানা বিপ্লবের মধ্যে পড়িয়া শাস্ত্রীয় বিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক দেশাচারের দোহাই দিয়া অনাচার প্রভৃতি অবলম্বন করিবার ফলেই ঘটিয়াছে।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যাও।

উচ্চ হ'তে আমারে গো
নামাইয়া নীচে
যাবে? যাও একেলা ফেলিয়া!
অহঙ্কার দুর্গচূড়ে
বসিয়া ছিলাম
পূজা দিতে সকলে আসিয়া।

শুভ কি অশুভ ক্ষণে
বুঝিতে পারি না
দাঁড়াইলে তুমি সেথা গিয়া,

শুভ কি অশুভ ক্ষণে
বুঝিতে পারি না
হৃদয়টি লইলে কাড়িয়া।

হৃদি সহ ঘোর রণে
পরাজয়ি তারে
উচ্চস্থানে ব'সেছিনু আমি,
দুর্ব্বল ও হৃদয়ের
যাতনার কথা
ধীরে ধীরে জানাইলে তুমি।

সে কথা শুনিয়া তবু
রহিনু অটল
পারিলে না আমারে নামাতে;
দুর্ব্বল ও হৃদয়ের
দারুণ যাতনা
দিন দিন লাগিল বাড়াতে।

বিষম সে যাতনায়
কতদিন তুমি
সারানিশি কাটালে জাগিয়া;
দিবসেতে ম্লানমুখে
মোর সাথে সাথে
ছায়াসম বেড়ালে ঘুরিয়া।

কোমল রমণী হৃদি
কঠোর জগতে
নিজ দুঃখ পারে সে সহিতে,

ভালবাসে যারে, সে যে
হৃদয়ের ধন,
তার দুঃখ পারে না দেখিতে।

অবশেষে নিরাশার
তীব্র যাতনায়
একদিন লাগিলে কাঁদিতে,
দারুণ মমতা ভরে
আকুল হইয়া
সেই দিন চাহিনু নামিতে।

দারুণ মমতা ভরে
এসেছি নামিয়া
প্রলোভনে প'ড়ে আসি নাই।
তিলমাত্র প্রত্যাশায়
হৃদয় আমার
ভুলিয়া গো হেথা আসে নাই।

স্বার্থপর ভাব হেথা
তিলমাত্র নাই
নাই তাই কঠোর ভর্ৎসনা
প্রেম যদি ভুলে থাক
ফিরে চলে যাও
জোর করে কাছে রাখিব না।

শ্রীভূপেন্দ্রবালা দেবী।

একটুতে এত।

(গল্প)

জয়রামের অন্তঃকরণে কিছুদিন ধরিয়া শত্রুর প্রতিশোধ লইবার জন্য আন্দোলিত হইয়া উঠিল, কি যে উপায় করিবে, তদ্বিষয়ে ঠিক একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিল না; অবশেষে একদিন বিরক্তভাবে রুষ্ট-মনে নিশীথে স্বীয় কক্ষে পদাঘাত করতঃ বলিয়া উঠিল "এই আমার সিদ্ধান্ত! আমি অন্তকসম হইয়া পশুপতি বাবুর বিনাশ সাধন করিব, এই আমার সিদ্ধান্ত।" চকিতে জানালার কাছ দিয়া একটী পেঁচা ডাকিয়া গেল। জয়রাম দন্তঘর্ষণ পূর্ব্বক কহিয়া উঠিল "আমি পশুপতির কাল-পেঁচার স্বরূপ হইব। আমি দস্যুদল গঠনপূর্ব্বক নিশীথে পশুপতির গৃহ-লুণ্ঠনসাধন করিব, গোপনে গোপনে যে কোন উপায়ে তাহার সর্ব্বনাশ সাধনই আমার ব্রত। এই ব্রত সম্পূর্ণ হইলে, জয়লাভ করিলে তবে আমার নাম জয়রাম।"

যে কোন প্রকারে শত্রুর উপর জয়লাভ করাই জয়রামের একমাত্র লক্ষ হইয়া দাঁড়াইল। সেই জয়লাভে যদি মন্দ উপায়ও আবশ্যক হয় তাহার পক্ষে তাহাও আহ্লাদের বিষয়।

৩

জয়রাম এক্ষণে শত্রুর প্রতিশোধার্থে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, দস্যুদলপতি হইয়াছেন। তাহার মনে শুধু প্রতিশোধ প্রতিশোধ---এই রব ধ্বনিত হইতেছে।

গ্রাম হইতে দূরে একটী বনের মাঝে জয়রাম একটী কুটীর রচনা করিয়াছে। সেই বনে কচিৎ কখনো পথিকেরা কাষ্ঠ আহরণার্থে গমন করিয়া থাকে, সদা সর্ব্বদা লোক সেথায় যাতায়াত করে না। সেই বনটী অতিশয় নির্জ্জন ছিল---যেন কল্পনার সুললিত আবাস। সেইখানে জয়-রাম একাকী বাস করিত এবং তাহার সঙ্গী গুপ্তচরের দ্বারা সংবাদ লইয়া অধীনস্থ দস্যুদিগকে তদনুসারে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিত। কিন্তু মাসাধিককাল অতিবাহিত হইয়া যাইতে লাগিল, তাহার শত্রুর প্রতি-

শোধের কিন্তু আর সুবিধা হইয়া উঠে না;—মহা বিরক্ত হইয়া জীবনের প্রতি হতশ্রদ্ধ হইয়াছে, মনে মনে, হয় আত্মহত্যা করিবে নয় গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবে সঙ্কল্প করিয়াছে।

জয়রামের মনের এই অবস্থায় অরণ্যে কুটীরের মধ্যে সন্ধ্যার সময় শিবরাম আসিয়া উপস্থিত হইল। শিবরাম বলিল "ভাই জয় তোমার মুখে ওরূপ রুষ্টভাব ও বিষাদ কালিমা দেখ্‌তে পাচ্ছি কেন?

জয়রাম। ভাই শিবু আর জয় বোলে ডেকো না, জয় আমার নাম নয়। আমি জয় নামের উপযুক্ত নহি।

শিবরাম। এত খাপ্পা হ'য়েছো কেন?

জয়রাম। পশুপতিকে জব্দ না কর্ত্তে পার্‌লে আমি জয়রাম নাম ত্যাগ কর্‌ব।

শিব। আমিতো তোমাকে পূর্ব্বেই ব'লেছি ওরূপ খাপ্পা হ'লেতো শত্রু জয় করতে পারবে না। শত্রুজয় কি সহজ ব্যাপার? শান্ত হও, অন্তরের শত্রুজয় কর, তবে বহিঃশত্রু সহজে তোমার আয়ত্ত হইবে।

জয়। ভাই তোমার দর্শন রেখে দাও।

শিব। দর্শন না হ'লে কার্য্যসিদ্ধি হবে কি ক'রে? দৃষ্টিহীন হইলে কি কখন লক্ষ্য ভেদ করা যায়? ভাই জয় আরও বলি এটা জেনো স্বয়ং বিষ্ণু সুদর্শন চক্রের জোরেই সকল শত্রু পরাজয় করেছিলেন। তাই বলি আগে সুদর্শন বা জ্ঞানরূপে দর্শনশক্তি চাই, পরে শত্রুজয় সহজ হবে। সুদর্শনের দ্বারা অন্তরের শত্রুজয় কর, বাহিরের শত্রু সহজে পরাজয় করতে পারবে।

জয়। তোমার মতে আমি অন্তরের শত্রু জয় করি আর বহিঃশত্রু এসে আমার সর্ব্বনাশ করুক।

শিব। দেখ ষড়রিপু জয় করলে সকল শত্রুজয় যে কেমন সহজে হয় তা দেখতে পাবে।

জয়। আচ্ছা সে এর পর দেখা যাবে, তখন তোমাকে গুরু ব'লে মানবো, তোমার চেলা হওয়া যাবে।—দূরে শৃগাল ডাকিয়া উঠিল—শুনিয়া শিবরাম উঠিল, বলিল "ভাই জয়রাম আজ উঠি। কাল আমার ওখানে কি

যাবে ? আমাদের সেই আড্ডায় একবার যেও।"

জয়। আচ্ছা।

৭

শিবরাম রাত্রে বাড়ী ফিরিতেছেন। জ্যোৎস্না রাত্রি, ঈষৎ দূর হইতে পাশে ফিরিয়া দেখিলেন যে দুইটী তরুণী পথে কতকি বলাবলি করিতেছে। তিনি গোপনে আরেকটু অগ্রসর হইয়া একটী গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলেন। নিস্তব্ধ রাত্রে মাঠে তাহাদের কথার প্রতিধ্বনি হইতেছিল। একজনের নাম শ্যামা, আরেক জনের নাম বামা। শ্যামা কথায় কথায় কি কথার সূত্রে তাহাদের গাঁয়ের জমীদারকে গাল দিয়া উঠিল। বামা প্রতিবাদ করিয়া বলিল "না ভাই শ্যামা জমীদারের দোষ আর কি ? গাঁয়ে আজকাল যে রকম ডাকাতের ভয় হ'য়েছে তাতে জমীদারের সকলের উপর সন্দেহ হ'য়েছে, এত চেষ্টা কচ্চে তবু ডাকাতের ভয় থামাতে পাচ্চে না, তাই কাছারীর আমলাদের উপর সন্দেহ হ'য়েছে। আমার এক বুনঝি তাদের বাড়ীর দাসী। তার ঠেঁয়ে আমি সব ভিতরকার খবর টের পাই।" শ্যামা বলিল "বামা তোর দেখ্‌ছি জমীদারের বাড়ীর দিকে টান আছে, তোর বুনঝি কাজ করে কিনা। আমার ভাই টান নাই, সেদিন জমীদারের লোকেরা আমার একটী গরু কেড়ে নিয়ে গেছে —একটু খাজনা দিতে দেরী হ'য়েছিল ব'লে আমার সেই পাটকিলে রঙের গাইটী কেড়ে নিয়ে গেছে।" বামা কহিল "সে আমলাদের দোষ।"

শ্যামা। "তা বৈকি সে আমলার দোষ জমীদারের আর কিছু দোষ নেই। জমীদারের উৎপাতে আমাদের বউ ঝি নিয়ে থাকা এক মহা বিপদ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আমার এক ভাইপো ছিল সে জমীদারের উৎপাতে কোথায় গিয়েছে। শুন্‌ছি নাকি সে কোন এক ডাকাতের দলে গিয়ে মিশেছে। জমীদারের উৎপাত সহ্য ক'রে মরার চেয়ে ডাকাতের দলে গিয়ে মিশেছে ভালই ক'রেছে।"

বামা। "ওলো, গিন্নি সেদিন কর্ত্তাকে বলছিলেন, 'ক্রমিকই ডাকাতের উৎপাত বৃদ্ধি পাচ্চে, ডাকাতের গুপ্তদল দিন দিন বাড়্‌ছে, কোন্ দিন যে আমাদের কাকে মারবে তার ঠিক নেই, আমাদের এত অতুল

সম্পত্তির অধিকারী হ'য়েও বেঁচে সুখ নাই। এতো দেখ্‌ছি যেদিন থেকে তুমি রামপ্রাণের উপর খারাপ ব্যবহার ক'রেছো তারপরেই থেকে এই সব উপদ্রব ঘট্‌ছে। আমি একবার বাপের বাড়ী যাবো ভেবেছিলাম, ডাকাতের ভয়ে আর যেতে পার্‌লেম না।' কর্ত্তা বল্লেন 'তুমি স্ত্রীলোক তোমার কথায় কথায় ভয়।' গিন্নি বল্লেন 'আমার প্রাণে কিছুমাত্র ভয় নেই তোমার জন্য আমার এত ভয়। আমি বলি তুমি রামপ্রাণ আমলাকে রাখ, সব ভাল হবে আমার বিশ্বাস। রামপ্রাণের বাস্তবিক কোন দোষ নাই তবে তাকে ছাড়ানো কেন? অন্যায় কর্ম্ম হচ্চে ব'লেই তো আমাদের এই সব খারাপ হচ্ছে। শুনেছি সকল চাকরবাকর বলে রামপ্রাণের মত ধার্ম্মিক লোক নেই। তার প্রাণে আঘাত দিও না তাহ'লে আমাদের প্রাণে আঘাত পড়বেই। আর সে নাকি আমাদের দূর আত্মীয়।' কর্ত্তা বল্লেন 'আমি আত্মীয় টাত্মীয় সব কিছু বুঝিনে। আমার মনের মতন লোক না হ'লে আমি তাকে রাখবো না।' গিন্নি বলিলেন 'তোমার মনের মত যে কথা বলে সেইতো তোমার মনের মত লোক হয় দেখেছি। এমন ভাল লোক যদি হয় যে তোমার মনের মত সর্ব্বদা কথা না বল্‌তে পারে কিন্তু তোমার সে হিতাকাঙ্ক্ষী।' কর্ত্তা বল্লেন 'তোমার আর পণ্ডিতি কর্‌তে হবে না।' কর্ত্তা রাগ করে অন্য ঘরে চ'লে গেলেন। শ্যামা কহিল "গিন্নিটী যথার্থ লক্ষ্মী। কর্ত্তাটীর মাথায় অলক্ষ্মী চেপেছে।" শিবরাম সকলি শুনিলেন। শুনিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। তাঁহার হাতে বাতি ছিল। বামা সর্ব্বাগ্রে তাহাকে দেখিতে পাইয়া বলিল "শ্যামা চল বোধ হয় কোন ডাকাত টাকাত হবে শীঘ্র চল্, সামনে মুদির দোকানে একটু বসে যাই। এখনো ঐ আলো জ্বলছে, মুদি জেগে আছে বোধ হয়। দুজনেই ভয়ে ভয়ে দ্রুতপদক্ষেপে মুদির দোকানের দিকে চলিল। শিবরাম তাহাদের ভয় বুঝিতে পারিয়া সে দিকে আর না গিয়া ভদ্রলোকের মত অন্য পথ দিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

(ক্রমশঃ)

মঙ্গল-সূত্র।

বৌদ্ধধর্ম্ম সেশ্বর কি নিরীশ্বর, সে কথার অনেক আলোচনা হইয়াছে। বৌদ্ধেরা নাস্তিক হইলেও অবিশ্বাসী নহে, আত্মা না মানিলেও উচ্ছৃঙ্খল দেহ-সর্ব্বস্ব নহে। কামিনী কাঞ্চনে এত বিতৃষ্ণা আর কোন ধর্ম্মে দেখা যায় না। শান্ত নিরীহ মুণ্ডিতশির গৈরিকধারী বৌদ্ধ সংসারে প্রয়াস-শূন্য হইলেও সংসারে ঘৃণা নাহি, শুষ্কপ্রাণ রোদনোন্মুখ শ্মশানের সে ভয়ঙ্কর দিনের চিন্তায় নয়নের জ্যোতি দেহের কান্তি মুখের সে মিষ্টহাসি হৃদয়ের সে কোমলতা সামাজিকতা প্রফুল্লতা বিসর্জ্জন করিয়া রিক্তহস্তে নদীতীরে বসিয়া নাই। যে অট্টহাস্যের উচ্চরবে হৃদয়ের শূন্যতা মস্তিষ্কের জড়তা প্রমাণ করে বৌদ্ধের তাহা নাই। যে আর্ত্তনাদে মোহ অজ্ঞানতা ও অপ্রস্তুততার পরিচয় দেয় বৌদ্ধের তাহাও নাই। দার্শনিকের গাম্ভীর্য্য, তপোধনের শান্তি কান্তি ও কোমলতা, বিষাদ মন্দীভূত প্রফুল্লতা, ছায়ামন্দীভূত কৌমুদীস্নাত হরিত ক্ষেত্র বা সুষুপ্তলহরী সরঃসলিল এমনি মধুর এমনি সুন্দর বৌদ্ধ জীবন। বৌদ্ধ শ্রমণকে অনেকে চিনে নাই।

বৌদ্ধগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত শ্রমণ ও উপাসক। শ্রমণ মণ্ডলীতে জাতি বিচার ছিল না। হৃদয়ের মহত্ত্বে চণ্ডাল ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইত, হৃদয়ের নীচতায় ব্রাহ্মণ চণ্ডাল বলিয়া গণ্য হইত। অথচ দ্বিজ-শোণিতের এমনি প্রখরতা, সহস্র সহস্র বৎসরের উৎকর্ষে দ্বিজরক্তে এমনি মহত্ত্ব জন্মিয়াছে, যে সেই বর্ণাবধিরীত বৌদ্ধসমাজে দ্বিজগণই শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। শত শত বৎসরের মধ্য দিয়া আঁধার অনুজ্জ্বলিত প্রাচীন পথে উচ্চশির আয়তবক্ষ যে মনীষিগণের অস্পষ্টচ্ছায়া নয়নপটে প্রতিভাত হইবে, দেখিবে সেই বৌদ্ধসঙ্ঘে সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন, কাশ্যপ ও অনুরুদ্ধ, আনন্দ ও ব্রহ্মদত্ত সকলেই ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়। এক উপালী নীচবর্ণ, বৌদ্ধ মহাভারতের বিদুর।

এই শ্রমণসঙ্ঘ দার্শনিকের মণ্ডলী। ঘট পট বিচার আচার বিনয় ও বৈরাগ্য এইখানে। বৌদ্ধদর্শনের সেই জটিলতা এই শ্রমণমণ্ডপে। সৌভাগ্য

ক্রমে ইহাদের ক্ষমতাও তত অধিক ছিল না এবং দার্শনিক মতভেদ হিন্দু সমাজের উদারতা কখন বিক্ষোভিত করে নাই। দার্শনিক মণ্ডলী তখন অনেক ছিল এবং যত মণ্ডলী ছিল মতভেদের সংখ্যা তাহার অপেক্ষা ন্যুন ছিল না। সুতরাং বৌদ্ধদর্শন নূতন বা পুরাতন হইলেও হিন্দু সমাজের তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই হয় নাই।

উপাসক বৌদ্ধগণ বৌদ্ধ সমাজের প্রাণ। তাঁহারাই শ্রমণদিগকে পোষণ করিতেন এবং বৌদ্ধ সমাজ পুষ্ট করিতেন। অথচ এই উপাসকদিগের জন্য কোন বিশেষ নিয়ম ছিল না। হিন্দু বা জৈন বৌদ্ধ উপাসক হইতে কোন আপত্তি ছিল না। ধর্ম্মবিশ্বাস যাহাই হউক শ্রমণাচার্য্যকে শ্রদ্ধা ও সঙ্ঘের পরিপোষণ করিলেই বৌদ্ধ উপাসক হইতে পারা যাইত। এখন হিন্দুসমাজে তান্ত্রিকের বৈষ্ণব হইতে কোন আপত্তি হয় না। তখনও বৌদ্ধ উপাসক হইলে ধর্ম্মচ্যুত, জাতিচ্যুত বা সমাজচ্যুত হইতে হইত না।

উপাসকগণের জন্য অতি সামান্য কয়েকটী নিয়ম বিহিত ছিল। সেগুলির কথা পরে বলা যাইবে। বৌদ্ধেরা কোন কর্ম্ম ভাল বাসিতেন, কোন কাজের প্রতি কেমন দৃষ্টি চাহিতেন নিম্ন উদ্ধৃত মঙ্গল সূত্রটী পাঠ করিলে বুঝা যাইবে।

বহূ দেবা মনুস্সা চ মঙ্গলানি অচিন্তযুং
আকাঙ্ক্ষমানা সোত্থানং ব্রূহি মঙ্গল মুত্তমং। ১
অসেবনা চ বালানং পণ্ডিতানঞ্চ সেবনা
পূজা চ পূজনীয়ানং এতং মঙ্গলমুত্তমং। ২
পতিরূপ দেসবাসো চ পুব্বে চ কতপুঞ্ঞতা
অত্ত সম্মাপ নিধি চ এতং মঙ্গল মুত্তমং। ৩
বাহু সচ্চঞ্চ সিপ্পঞ্চ বিনয়োচ সুসিক্খিতো
সুভাসিতা চ যা বাচা এতং মঙ্গল মুত্তমং। ৪
মাতাপিতু উপট্ঠানং পুত্তদারস্স সংগহো
অনাকুলাচ কম্মন্তা এতং মঙ্গল মুত্তমং। ৫
দানঞ্চ ধর্ম্ম চরিয়ঞ্চ ঞাত কানঞ্চ সংগহো
অনবজ্জানি কম্মাণি এতং মঙ্গল মুত্তমং। ৬

আরতী বিরতি পাপা মজ্জপানা চ সঞ্ঞমো
অপ্পমাদো চ ধম্মেসু এতং মঙ্গল মুত্তমং। ৭
গারবোচ নিবাতো চ সন্তুট্‌ঠী চ কতঞ্ঞুতা
কালেন ধম্মসবনং এতং মঙ্গল মুত্তমং। ৮
খন্তী চ সোবচস্‌সতা সমণানঞ্চ দস্‌সনং
কালেন ধম্মসাকচ্ছা এতং মঙ্গল মুত্তমং। ৯
তপোচ ব্রহ্মচরিয়ঞ্চ অরিয় সচ্চানদস্‌সনং
নিব্বানসচ্ছিকিরিয়াচ এতং মঙ্গল মুত্তমং। ১০
ফুট্‌ঠস্‌স লোক ধম্মেহি চিত্তং যস্‌সন কম্পতি
অসোকং বিরজং খেমং এতং মঙ্গলমুত্তমং। ১১
এতা দিসানি কত্বান সব্বত্থম পরাজিতা
সব্বত্থ সোত্থিং গচ্ছন্তি তং তেসং মঙ্গল মুত্তমন্তি। ১২

অনুবাদ।

প্রভো! মঙ্গল কামনা করিয়া বহু দেব ও মনুষ্যগণ মঙ্গল চিন্তা করিয়াছিলেন, সুতরাং কিসে উত্তম মঙ্গল হয় আপনি বলুন। ১

অজ্ঞানীগণের অসেবন, পণ্ডিতগণের সেবন, পূজনীয়গণের পূজা ইহাই উত্তম মঙ্গল। ২

প্রতিরূপ দেশে বাস, পূর্ব্বজন্মকৃত পুণ্য কর্ম্মের ন্যায় পুণ্য কর্ম্ম করা এবং সৎকর্ম্মে আত্ম নিয়োগ করা ইহাই উত্তম মঙ্গল। ৩

বহু শ্রুততা, শিল্পশিক্ষা, বিনয়শাস্ত্র সুশিক্ষা করা এবং সুভাষিত কথা বলা ইহাই উত্তম মঙ্গল। ৪

পিতামাতার সেবা করা, স্ত্রীপুত্রের সেবা করা কুশল কর্ম্ম করা, ইহাই উত্তম মঙ্গল। ৫

দান ও ধর্ম্মচর্য্যা, জ্ঞাতিগণের সেবা এবং প্রশংসনীয় কর্ম্ম করা, ইহাই উত্তম মঙ্গল। ৬

পাপ হইতে বিরতি ও পাপে অনাসক্তি, মদ্যপানে অনাসক্তি এবং ধর্ম্মকর্ম্মে সতর্কতা, ইহাই উত্তম মঙ্গল। ৭

গুরুজনের গৌরব করা, বিনীত হওয়া, সন্তুষ্ট হওয়া, কৃতজ্ঞ হওয়া, যথাকালে ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ, ইহাই উত্তম মঙ্গল। ৮

ক্ষান্তি, সুবাধ্যতা, শ্রমণগণের দর্শন, যথা কালে ধর্ম্মালাপ করা, ইহাই উত্তম মঙ্গল। ৯

তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য আর্য্যসত্যদর্শন, নির্ব্বাণ লাভের উপযুক্ত সংকার্য্য, ইহাই উত্তম মঙ্গল। ১০

লাভ অলাভ যশ অযশ নিন্দা প্রশংসা সুখ দুঃখ এই আট প্রকার লোকধর্ম্ম দ্বারা অভিভূত হইয়া যাহার চিত্ত কম্পিত হয় না, শোক শূন্যতা রাজসিক গুণ শূন্যতা এবং ভয় শূন্যতা, ইহাই উত্তম মঙ্গল। ১১

এইরূপ কার্য্য করিয়া সর্ব্বত্র অপরাজিত হইয়া সর্ব্বত্র মঙ্গল পাওয়া যায় তাই ইহাদিগকে মঙ্গল কার্য্য বলিতেছি। ১২

গৃহী বা উপাসক বৌদ্ধগণ শ্রমণদিগের ন্যায় মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিতেন। তাহাতেও হিন্দুসমাজে থাকিবার পক্ষে কোন গোলযোগ হইত না। মন্ত্র গ্রহণকে বৌদ্ধেরা ত্রিশরণ গ্রহণ বলিতেন। গৃহীরা শ্রমণদিগের মত পঞ্চশীল বা অষ্টশীল গ্রহণ করিতে পারিতেন কিন্তু শ্রমণ বা ভিক্ষু বৌদ্ধ ভিন্ন দশশীল গ্রহণ করিবার অধিকার কাহারও ছিল না। ত্রিশরণ, পঞ্চশীল ও দশশীলের মন্ত্র এই,—

ত্রিশরণ।

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি ধম্মং সরণং গচ্ছামি সংঘং সরণং গচ্ছামি।

বুদ্ধের শরণ লই, ধর্ম্মের শরণ লই, সংঘের শরণ লই।

পঞ্চশীল।

১। পাণাতিপাতা বেরমণী শিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

২। অদিন্নাদানা বেরমণী শিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

৩। কামেসু মিচ্ছাচারা বেরমণী শিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

৪। মুসাবাদা বেরমণী শিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

৫। সুরামেরয় মজ্জপমাদট্ঠানা বেরমণী শিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

অনুবাদ।

১। প্রাণীহত্যা করিব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

২। অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করিব না—ঐ

৩। কামহেতু যথেচ্ছাচার করিব না—ঐ

৪। মিথ্যা কথা বলিব না—ঐ

৫। সুরা বা মৈরেয় প্রভৃতি কোন প্রকার মাদক দ্রব্য গ্রহণ করিব না—ঐ

অষ্টশীল।

পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী এবং

৬। বিকালভোজনা বেরমণী শিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

৭। নচ্চগীত বাদিত বিসুক দস্সনা মালাগন্ধ বিলেপন ধারণ মণ্ডন বিভূষণ ঠ্ঠানা বেরমণী শিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

৮। উচ্চাশয়ন মহাসয়না বেরমণী শিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

অনুবাদ।

৬। বিকাল ভোজন করিব না।

৭। নৃত্য গীত বাদ্য উৎসব দর্শন মালাগন্ধ বিলেপন ধারণ মণ্ডন ও বিভূষণ করিব না।

৮। উচ্চশয়ন ও মহা শয়ন গ্রহণ করিব না।

বৌদ্ধদিগের কয়েকটী ধ্যান বা ভাবনা বড় সুন্দর।

মেত্ত ভাবনা।

সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু অবেরা হোন্তু
অব্যাপজ্ঝা হোন্তু অনীঘা হোন্তু সুখী, অত্তানং পরিহরন্তু।
সব্বে সত্তা দুকখা পমুচ্চন্তু। সব্বে সত্তা মা
যথালদ্ধো সম্পত্তিতো বিগচ্ছন্তু।

সব্বে সত্ত কম্মস্সকা কম্মদায়াদা কম্মযোনী
কম্মবন্ধু কম্মপটি সরণাযং কম্মং করিস্সন্তি
কল্যাণং বা পাপকং বা তস্সদায়াদা ভবিস্সন্তি।

অনুবাদ।

সকল জীব সুখী হোক, অবের হোক, অবধ্য হোক, অহিংসিত হোক, সুখী হইয়া কালহরণ করুক। সকল জীব দুঃখ মুক্ত হোক, যথালব্ধ সম্পত্তি হইতে কেহ বঞ্চিত না হোক। সকল জীব কর্ম্মের স্বকীয়, কর্ম্মের দায়াদ, কর্ম্মযোনী কর্ম্মবন্ধু কর্ম্মাশ্রিত হইয়া যে কর্ম্ম করিবে, কল্যাণ বা পাপ কর্ম্ম করিবে তাহার ফলভাগী হইবে।

হিতভাবনা।

সাসনস্সচ লোকস্স বুড্ডী ভবতু সব্বদা
সাসনম্পি চ লোকঞ্চ দেবা রক্খন্তু সব্বদা
সদ্ধিং হোন্তু সুখী সব্বে পরিবারেহি অত্তনো
অনীঘা সুমনা হোন্তু সহ সব্বেহি এত্তাতিভি

ধর্ম্ম ও জগতের সর্ব্বদা শ্রীবৃদ্ধি হোক, দেবগণ ধর্ম্ম ও জগৎকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। সকলে স্ব স্ব পরিবার ও জ্ঞাতিবর্গের সহিত শরীরে ও মনে সুখী ও ব্যাধি রহিত হোক।

তবে কি বৌদ্ধগণ নাস্তিক দুঃখপ্রিয় মঙ্গলকাতর ও মৃত্যুকামী?

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

মানব শরীরে বহির্বায়ুর প্রভাব।

মানব শরীর যেমন অন্তরের বায়ুর ক্রিয়া দ্বারা জীবিত সেইরূপ বহির্বায়ুর দ্বারাও অনুপ্রাণিত। উভয়ের মধ্যে একটীর অভাব হইলে মানব-শরীর নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। গ্রীষ্মকালে যদি ক্ষণকালের জন্ত বহির্বায়ু নিশ্চল অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে শরীর একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে। জীবগণ বায়ুদ্বারা জীবন ধারণ করে। সমস্ত জগৎ বায়ুময়। এই বহির্বায়ুর প্রভাব যে মানব শরীরে কত গুরুতর সে বিষয়ে আয়ুর্ব্বেদ-জন্মদাতা জ্ঞানী ঋষিগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন তৎসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ এই প্রবন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

বহির্বায়ু অর্থাৎ পৃথিবীর উপরিস্থিত বায়ু, যাহাকে স্থূল বায়ু কহে, উহা চতুর্দ্দিক হইতে প্রবাহিত হইয়া থাকে বটে কিন্তু মানবগণ এক সময়ে ঐ চতুর্দ্দিক হইতে প্রবাহিত বায়ুর ক্রিয়া অনুভব করিতে পারেন না, কারণ পৃথিবীর সকল স্থানেই সেই চারি প্রকার বায়ু এক সময়ে প্রবাহিত হইতে দেখা যায় না। এ দেশে দক্ষিণ বায়ুই সর্ব্বপ্রধান, উক্ত বায়ু সেবনে মানবগণের মন ও শরীর পুলকিত হয়, সকলেই আগ্রহের সহিত দক্ষিণ বায়ু সেবনে তৎপর হইয়া থাকেন। বসন্তকালে দক্ষিণ হইতে প্রবাহিত বায়ু মলয় পবন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মলয় মারুত সেবনে মানবগণ অত্যন্ত স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া দেহের মধ্যে নব ভাব অনুভব করিয়া থাকেন বলিয়া এবম্ভূত মারুত মানবের পক্ষে অতীব সুখজনক হইয়া থাকে। দক্ষিণ মারুত এ প্রদেশে অসীম সুখপ্রদ বলিয়া সকল লোকেই প্রায় তাঁহাদের আবাস দক্ষিণদ্বারী করিতে ও গৃহাদির গবাক্ষনিচয় দক্ষিণাভি-মুখে রাখিতে সতত যত্নবান্ হইয়া থাকেন। পশ্চিম প্রভৃতি দূর প্রদেশে এ প্রকার গৃহাদি প্রস্তুত করণে প্রথা প্রায়ই দেখা যায় না, কারণ তদ্দেশ-বাসীগণ দক্ষিণ মলয় মারুত ও তাহার গুণাগুণ সুখে বঞ্চিত।

শাস্ত্রে আর্য্য ঋষিগণ দক্ষিণ বায়ুর বিষয়ে বলিয়াছেন—

দক্ষিণো মারুতো বল্য শ্চক্ষুষ্যঃ শস্যঘাতকঃ।
মধুরশ্চাম্লদাহীচ কষায়াম্লরসো লঘুঃ॥
রক্তপিত্ত প্রশমনো নচ মারুতকোপনঃ।
গণ্ডুপদাদি কীটানাং জনকঃ প্রাণকারকঃ॥

দক্ষিণ মারুত বলকারক চক্ষের পক্ষে হিতকারী কিন্তু অকালে প্রবাহিত হইলে শস্য সমূহ নষ্ট করিয়া থাকে, উক্ত বায়ু মধুর, লঘু অম্ল ও বিদাহজনক এবং কষায় রসের ক্রিয়া উৎপন্ন করিয়া থাকে, রক্তপিত্ত প্রশমনকারী এবং উহা সেবনে দেহস্থ বায়ু কুপিত হয় না, যদিও গণ্ডুপদাদিজনক বটে কিন্তু দক্ষিণ মারুত জীবের প্রাণস্বরূপ হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে পশ্চিম প্রভৃতি দূর প্রদেশবাসীগণ মলয় মারুত সুখের আস্বাদ হইতে বঞ্চিত, তাঁহারা তদ্দেশ প্রবাহিত পবনেরই প্রসংশা করিয়া থাকেন; বাস্তবিক বিশেষ বিবেচনা করিতে হইলে পশ্চিম প্রবাহিত বায়ুই তথাকার লোকের পক্ষে বিশেষ হিতকারী। কেবল তাহাই নহে, এ প্রদেশের অধিবাসীগণ উক্ত বায়ুর উপকারিতা শক্তি এখান হইতে অনুভব করিতে পারে না বলিয়া তাঁহারা শারীরিক বা মানসিক উপকার প্রাপ্তি মানসে পশ্চিম প্রভৃতি স্থানে গমনান্তর তথাকার জলবায়ু সেবনে তাহার উপকারিতা শক্তি উপলব্ধি করিয়া অতীব আনন্দানুভব করিয়া থাকেন। নানা কারণে এ দেশের জল ও বায়ু দূষিত হইয়াছে কিন্তু পশ্চিম প্রদেশের জলবায়ু তদ্রূপ ভাবাপন্ন হয় নাই। শাস্ত্রেও ঋষিগণ পশ্চিম বায়ুর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন;—

পশ্চিমোঽগ্নিবপুর্বর্ণবলারোগ্যাবিবর্দ্ধনঃ।
কষায়ঃ শোষণঃ স্বর্য্যো রোচনো বিশদো লঘুঃ॥
অপাং লঘুত্ব বৈশদ্য শৈত্য বৈমল্য কারকঃ।
সর্ব্বদ্রব্যেষ্বভিব্যক্ত প্রভাব রসবীর্য্যকৃৎ॥
ব্রণসংরোপণস্তম্ভো দাহ শোথ তৃষাপহঃ॥

পশ্চিম বায়ু সেবনে পরিপাক শক্তি, শরীর, বর্ণ ও বলের বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং রোগীগণ পীড়া হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। পশ্চিম

বায়ু স্বরকারক, রুচিজনক, লঘু ও নির্ম্মল, উক্ত বায়ু তথাকার জলের লঘুতা বিশদতা নৈর্ম্মল্য ও শীতলতা শক্তি উৎপাদন করিয়া থাকে, তথাকার, সমস্ত দ্রব্যই বায়ু কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত হইয়া রস ও বীর্য্যের প্রভাব বৃদ্ধি করিয়া থাকে। পশ্চিম বায়ু ব্রণ ও চর্ম্মের পক্ষে বিশেষ হিতজনক এবং উহা সেবনে শোথ ও তৃষ্ণা রোগ প্রভৃতি উপশম প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

উত্তর দিক্ হইতে প্রবাহিত বায়ু স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী নহে, উহা সেবনে দেহে নানা প্রকার রোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে। উত্তর বায়ু অন্য সময় প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না, সাধারণতঃ শীত ঋতুতে অনুভূত হইয়া থাকে। গিরিরাজ হিমালয় স্পর্শ করিয়া এই সকল প্রদেশে প্রবাহিত হয় বলিয়া বোধ হয় ঐ বায়ু প্রবাহ সময় শীতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে, উক্ত বায়ুর কিছু সামান্য গুণ থাকিলেও স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকারক হইয়া থাকে। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

উত্তরো মারুতঃ স্নিগ্ধো মৃদুর্ম্মধুর এবচ।
কষায়ানুরসঃ শীতঃ সর্ব্বদোষ প্রকোপনঃ॥
ক্ষীণক্ষতবিষার্ত্তানাং হিতো দাহতৃষাপহঃ।
শীতাধিকং সনীহারঃ সবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুবান্॥

উত্তর মারুত স্নিগ্ধ, মৃদু, মধুর ও শীতজনক। উহা সেবনে আহার্য্য বস্তু পরিপাক কালে কষায় রসের ক্রিয়া সম্পাদন ও দেহস্থিত বায়ু পিত্ত ও কফ দোষত্রয়ের বিকৃতি ভাব উৎপন্ন করিয়া থাকে। দুর্ব্বল, ক্ষতরোগী এবং বিষপীড়িত ব্যক্তির পক্ষে উত্তর বায়ু বিশেষ হিতকারী, দাহ ও পিপাসা নষ্ট করিয়া থাকে। উত্তর প্রবাহিত বায়ু অত্যন্ত শীতল ও নীহারযুক্ত এবং প্রবাহ সময়ে আকাশমার্গে মেঘরাশি একত্রিত হইয়া বিদ্যুৎ ও ঘন ঘন ঘনগর্জ্জন হইয়া থাকে।

এই প্রকার ব্যজন বায়ুর গুণাগুণও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে, কিন্তু তন্মধ্যে তালপত্র ব্যজন বায়ুর গুণ অন্য ব্যজন বায়ু অপেক্ষা উত্তম দেখিতে পাওয়া যায়।

মূর্চ্ছাদাহ তৃষাস্বেদশ্রমঘ্নো ব্যজনানিলঃ।
তালবৃন্তময়ো বাত স্ত্রিদোষশমনো লঘুঃ॥

বংশব্যজনজো বাতো রুক্ষোষ্ণবাতপিত্তদঃ।
বালব্যজন যোজস্কং মক্ষিকাদীন্ ব্যপোহতি॥
ময়ূরা বস্ত্রজা বৈত্রা বাতো দোষত্রয়াপহঃ॥

ব্যজন বায়ু সাধারণত মূর্চ্ছা দাহ পিপাসা ঘর্ম্ম ও শ্রমের অপনয়ন করিয়া থাকে, তন্মধ্যে তালপত্র নির্ম্মিত ব্যজন বায়ু লঘু এবং দেহস্থ দোষ সকল কুপিত হইলে তাহা উপশম করে। বংশ নির্ম্মিত ব্যজন বায়ু রুক্ষ, উষ্ণগুণ বিশিষ্ট এবং বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ জন্মাইয়া থাকে। কেশ নির্ম্মিত ব্যজন অর্থাৎ চামর প্রভৃতির বায়ু শরীরস্থ ওজ ধাতুর বৃদ্ধি ও মক্ষিকাদি স্থানান্তরিত করে। ময়ূরপক্ষ নির্ম্মিত অথবা বস্ত্রনির্ম্মিত কিম্বা বেত্র নির্ম্মিত ব্যজন বায়ুর দ্বারা কুপিত দোষত্রয়ের শান্তি হইয়া থাকে।

প্রায় সমস্ত বহির্বায়ুর বিষয় ক্রমে ক্রমে আলোচিত হইল, কেবল মাত্র পূর্ব্ববায়ুর বিষয় আলোচনা করা হয় নাই। পূর্ব্ব দিক্ হইতে প্রবাহিত অনিল অন্যান্য বায়ু অপেক্ষা হীনগুণ বিশিষ্ট, ঐ বায়ু অযথা সেবনে দেহে নানা প্রকার ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তন্মধ্যে ক্রিমি রোগ প্রায়ই সর্ব্বাগ্রে দেখা যায়। সেইজন্য সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে পূর্ব্বদেশবাসী ব্যক্তিগণ প্রায়ই ক্রিমি রোগাক্রান্ত হইয়া থাকেন, এমনি কি তথাকার জল বায়ুর দোষে তদ্দেশজাত সুমধুর আম্রফলেও কীটাদি জন্মিয়া থাকে। শাস্ত্রকারগণ ঐ বায়ুর বিষয় বলিয়াছেন—

প্রাগ্বাতো মধুর ক্ষারো বহ্নিমান্দ্যকরো গুরুঃ।
বৈরস্যগৌরবৌষ্ণ্যানি করোত্যপস্বোষধীষু চ॥
ভগ্নোৎপিষ্টক্ষতাদ্যেষু রাগশ্বয়থুদাহকৃৎ।
সন্নিপাতজ্বরশ্বাস অর্দ্দোবার্শোবিষক্রিমীন্।
কোপয়েৎ আমবাতঞ্চ ঘনসংঘাতকারণং॥

পূর্ব্ব প্রবাহিত বায়ু মধুর, ক্ষারগুণবিশিষ্ট, ঐ বায়ু সেবনে অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। উক্ত বায়ু তথাকার ভেষজদ্রব্য সমূহের ও জলের বিরসতা গুরুতা এবং উষ্ণতা শক্তি উৎপাদন করে

ভগ্ন ও ক্ষতাদি রোগের বৃদ্ধি করে এবং দাহ জন্মাইয়া থাকে। পূর্ব্ব বায়ু সেবনে সন্নিপাত জর, শ্বাস, চর্ম্মরোগ, অর্শ, আমবাত ও বিশেষতঃ ক্রিমি রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বায়ু পূর্ব্ব হইতে অনবরত প্রবাহিত হইলে মেঘরাশি একত্রিত হইয়া অত্যন্ত বৃষ্টি বা বাদ্‌লা হইয়া থাকে।

হুগলী জেলার অন্তর্গত গুপ্তপাড়া একটী প্রাচীন সমাজগ্রাম। বৈদ্য প্রধান গ্রাম বলিয়াই উক্ত গ্রামের নাম গুপ্তপাড়া হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ঐ গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি নানা শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়া বিশেষ ব্যুৎপন্নশালী গভীর জ্ঞান বিশিষ্ট অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে কৃষ্ণনগরের অধীশ্বর পণ্ডিত গুণগ্রাহী রসভাবজ্ঞ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের বিদ্যাবত্তায় বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে স্বীয় রাজসভার সভাপণ্ডিতপদে বরণ করিয়াছিলেন। তৎকালে কোন বিশিষ্ট সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া পণ্ডিত প্রবর বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয় যশোহর নগরে গমন করিয়াছিলেন। তথায় কিয়দ্দিবস অবস্থিতি করিয়া পুনরায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানী কৃষ্ণনগরে প্রত্যাগমন করতঃ রাজসভায় উপস্থিত হইলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে সাদর সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বিদ্যালঙ্কার মহাশয়! যশোহর কেমন দেখিলেন? তথাকার জলবায়ু কি প্রকার? বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয় পরম সুরসিক ও উপস্থিত কবি ছিলেন, তিনি কহিলেন, মহারাজ! তথাকার জল বায়ুর প্রকৃতি অতি চমৎকার;

জগৎ প্রাণো হরেৎ প্রাণান্ জীবনং জীবনং হরেৎ।
যশোহরে কিমাশ্চর্য্যং প্রাণদা যমদূতিকা॥

সমস্ত জীবের প্রাণস্বরূপ বলিয়া বায়ুর অপর একটী নাম জগৎপ্রাণ, এমন জগৎপ্রাণ (বায়ু) তথায় প্রাণিগণের প্রাণহরণ করে, এবং তথাকার জীবন (জল) জীবগণের জীবন নষ্ট করিয়া থাকে, মহারাজ! যশোহর নগরে এই এক অদ্ভুত আশ্চর্য্য দেখিলাম, যমদূতিকা (তিন্তিড়ী) প্রাণীগণের প্রাণদান করিয়া থাকে। এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই তথাকার জলবায়ু কিছুই ভাল নহে, অধিকন্তু সকল ব্যক্তিই প্রায় তেঁতুল প্রিয়, এবং তাহা

ভক্ষণ করিয়া যশোহরবাসী লোকের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। পণ্ডিত চূড়ামণি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের এমন উপস্থিত সুমিষ্ট কবিতা শ্রবণে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এবং সভাস্থ সকলেই ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত।

তাম্বুরু ও ৺কালিপ্রসন্ন সিংহ।

আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে যে মূলভাব বিরাজমান আমাদিগের সঙ্গীত শাস্ত্রেও সেই এক ভাবের প্রাধান্য দেখিতে পাই সেই মূল ভাবটী এই, "একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।" ভগবান যেমন তাঁহার একরূপ লইয়া কত বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতেছেন, সেইরূপ আমাদের দেশে কলাবতেরা তাম্বুরা সেই একঘেঁয়ে স্বরপ্রবাহ অবলম্বন করতঃ রাগ রাগিণীর বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতে ভাল বাসেন। আমাদের দেশে গায়ক মাত্রেই গানের মজলিসে তাম্বুর লইয়া গাহিবার জন্য সতত সমুৎকণ্ঠ হইয়া থাকেন। যন্ত্রটী স্কন্ধদেশে লইয়া ওস্তাদেরা কিরূপে সঙ্গীতের সাহায্যে আনন্দ বিধান করেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। অঙ্গুলির আঘাতে জলস্রোতের মত অনবরত ধ্বনিস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে, সেই ধ্বনিপ্রবাহের মধ্যে গায়কের প্রাণ ভাসিয়া গীতিতরিখানিকে হেলাইয়া দোলাইয়া লইয়া যায়।

বহুকাল হইতে এ দেশে তাম্বুরুর আদর দেখিতে পাওয়া যায়. ভারতের প্রসিদ্ধ গায়ক নায়ক গোপাল সঙ্গীতের দ্বারা ভারত জয় করিবার সময় জয়চিহ্ন স্বরূপ একেকটী তাম্বুরা গ্রহণ করিয়াছিলেন। চলিত কথায় গায়কেরা বলেন "তিনি তাম্বুরা জয় করিয়াছিলেন।" কথিত আছে প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ বাজ খাঁ তাম্বুরার স্বরের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতেন। তজ্জন্য তাঁহার স্বাভাবিক গলায় স্বর কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয়া যাওয়াতে

লোকে গায়কের বিকৃত স্বর দেখিলেই তাহাকে বাজখেঁয়ে গলা বলিয়া ঈষৎ হেয়চক্ষে দেখিয়া থাকে। বাজখাঁ নিজ গলার স্বরের প্রাধান্য ভুলিয়া তাম্বুরুকে এমনি আদরের চক্ষে দেখিতেন যে তাহার স্বরের অনুকরণ করিয়া নিজের গলাকে অস্বাভাবিক করিয়া তুলিলেন। পূর্ব্বে তাম্বুরুর কত সম্মান ছিল। আমাদের এই একালেও কিছুকাল পূর্ব্বে আমি দেখিয়াছি যে আমাদের কোন আত্মীয় অপর একজন আত্মীয়ের গানে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক সুবৃহৎ ও মূল্যবান তাম্বুরু দান করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি তাম্বুরুর প্রতি পূর্ব্বেকার শ্রদ্ধা অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। আজকাল হারমোনিয়ম, পিয়ানো প্রভৃতি যন্ত্র, তাম্বুরার প্রতি যত্নের যেন অন্তরায় স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। অনেকের ঘরে তাম্বুরা এককোণে পড়িয়া নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। যাই হোক, তথাপি এখনও হিন্দুস্থানী কলাবতী গানের সঙ্গে তাম্বুরু যন্ত্রটী যেন অপরিহার্য্য বলিয়া বোধ হয়।

এই তাম্বুরু যন্ত্রটী একরূপ বীণার শ্রেণীভুক্ত। লোকপ্রসিদ্ধি আছে যে এই বীণা তুম্বুরু নামক গন্ধর্ব্ব ঋষি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার নাম তম্বুরু হইয়াছে।

"শিবস্য বৃহতী বীণা তুম্বুরোস্ত কলাবতী
মহতী নারদস্যৈব সরস্বত্যাস্তু কচ্ছপী।

শিবের বৃহতী নামক বীণা, তুম্বুরুর বীণার নাম কলাবতী, নারদের বীণাকে মহতী বলে, আর সরস্বতীর বীণার নাম কচ্ছপী।

বীণা ভারতের অতি প্রাচীন যন্ত্র। যেমন একই কানাড়া ভাঙ্গিয়া অষ্টাদশ প্রকার কানাড়া হইয়াছে, সেইরূপ একই বীণা ভাঙ্গিয়া অবস্থা ভেদে দেশভেদে নানারূপ হইয়া পড়িয়াছে। তাম্বুরা, সেতার, গিটার (Guitar) প্রভৃতি এই শ্রেণীর সকল যন্ত্রই বীণারই রূপান্তর মাত্র। ভারত সঙ্গীতজ্ঞ উইলিয়ার্ড সাহেব তাম্বুরাকে গিটার জাতীয় বলিয়াছেন এবং সেই গিটার জাতীয় যন্ত্রের মধ্যে তাম্বুরাকে সর্ব্বাপেক্ষা সরল ও সহজ রকমের বলিয়া গিয়াছেন।

"The Tumboora or Tanpoora is another very ancient instrument and the simplest of all those of the Guitar kind.

It somewhat resembles that instrument, but has a very long neck without frets.

তাম্বুরা 'তত' যন্ত্রের অন্তর্গত। সঙ্গীত দামোদরে আছে "ততানদ্ধক শুষিরং ঘনমিতি চতুর্ব্বিধম্।" ভারত সঙ্গীতাচার্য্যেরা সঙ্গীত যন্ত্রগুলিকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে ততযন্ত্র তন্ত্রযুক্ত যন্ত্র। তন্ত্রের মূল ধাতু হইতেই 'তত' কথা আসিয়াছে। বীণার একটী সাধারণ নাম ছিল ত্রিতন্ত্রী। পূর্ব্বে বৈদিককালে আমার বিশ্বাস, ভারতে সচরাচর সকল প্রকার বীণাতেই তিনটী করিয়া তাঁত বা তার ব্যবহৃত হইত। একটী উদাত্ত অর্থাৎ উচ্চ স্বর, একটী অনুদাত্ত অর্থাৎ নীচস্বর এবং আরেকটী স্বরিত অর্থাৎ সমাহার বা মধ্যস্থ যোগরক্ষাকারী স্বর।

পাণিনী ব্যাকরণে আছে 'উচ্চৈরুদাত্ত'; 'নীচৈরনুদাত্ত'; এবং 'সমাহারঃ স্বরিতঃ।' কালক্রমে এই তিনটী স্বর তিনটী বিভাগে দাঁড়াইল—হইল "উদাত্তৌ নিষাদ গান্ধারৌ" "অনুদাত্তৌ ঋষভধৈবতৌ" আর "স্বরিত প্রভবা-হ্যেতে ষড়জ মধ্যম পঞ্চমাঃ।" তিন স্বর হইতে ক্রমে সাতস্বর হইল, ক্রমে পুনরায় বার স্বর হইল।

কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে বৈদিককালে সঙ্গীতের আদি অবস্থায় বৈদিক তিনটী স্বর ত্রিভুবন রূপে বিরাজ করিত, তাহা গানে যন্ত্রে ব্যবহৃত হইত। বৈদিককালে ত্রিস্বর্যা গানেই সম্ভবতঃ সামবেদ গীত ও বাদিত হইত। অন্ততঃ তিনের অধিক স্বরে গান গীত হইলেও বৈদিক সময়ের বীণা যে তিনটী স্বরে বাঁধা হইত এ বিষয়ে বোধ হয় কাহারও কোন সন্দেহ নাই, যেহেতু বীণার সাধারণতঃ এক নামই ত্রিতন্ত্রী (অর্থাৎ তিন তাঁত বিশিষ্ট) ছিল। সকল প্রকার বীণারই তিনটী করিয়া তাঁত থাকিত। তখন বলা বাহুল্য তাম্বুরা বীণাও এ নিয়ম হইতে অব্যাহতি পায় নাই। উইলার্ড সাহেবও তাম্বুরা সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন ;—

"It (Tumboora) is strong with three or four wire strings, one bras and rest steel.

অধুনাকালে তাম্বুরার চারিটী করিয়া তার বাঁধার নিয়ম দাঁড়াইয়াছে। সকলেই চারিটী করিয়া তারেই তাম্বুরা বাঁধে। মাঝের দুই তার উচ্চ



তাম্বুরা।

ক—জুড়ির একটী তার	ছ—মান্‌কা
খ—জুড়ির অপর তার	জ—সোয়ারি
গ—মুদারা খরজ	দ—তবলি
ঘ—মুদারা পঞ্চম	ধ—আড়ি
চ—অলাবু বা তুম্বী	ন—দাণ্ডি

খরজ এবং ডান দিকেরটী পঞ্চম; বামদিকের তার নিম্নখরজ। আরও ভাল্ করিয়া বলি, গায়ক তাঁহার দক্ষিণ স্কন্ধে তাম্বুরাকে দণ্ডায়মান করতঃ স্থাপনপূর্ব্বক বাম করের দিক হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম কাঁচা পিত্তলের তারটী পঞ্চম বুঝিবেন, তাহার পর মাঝের পাকা তার দুটীকে সুর বুঝিবেন আর তার পরের কাঁচা পিত্তলের তারটীকে খরজ বুঝিবেন। যাই হোক তাম্বুক বাঁধিবার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট সুর নাই। অনেক সময়ে গায়ক তাহার সুবিধানুসারে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে বাঁধে। মোটের উপর দেখা যায় তাম্বুরুতে উদারা মুদারা ও তারা এই তিনটীর খরজ যেন তিনটী সপ্তকের মূল প্রাণরূপে বিরাজ করে। মাঝের পাকা তারদ্বয় মধ্যগ্রামের সা সুরে বাঁধিতে হয়; এবং ডাহিন দিকের কাঁচা পিত্তলের তারটী মন্দ্রগ্রামের সা সুরে বাঁধিতে হয়; এবং বাঁদিকের পিত্তলনির্ম্মিত কাঁচা তারটী মন্দ্রগ্রামের পা সুরে বাঁধিতে হয়। সুর বাঁধা শেষ হইলে সোয়ারির প্রত্যেক তারস্থিত সুতা বা রেশম টানিয়া এরূপস্থলে রক্ষা করিতে হইবে যথায় রাখিলে তাম্বুরার সুর একটু মোলায়েম ও মিষ্ট হয়। বাঁধা সুরে কিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ লক্ষিত হইলে, ঠিকটী মিলিতেছে না এরূপ বোধ হইলে, মানকা সরাইয়া সরাইয়া তাহা ঠিক করিয়া যাইতে হইবে।

তাম্বুরা বাজাইবার সময় উদারার খরজে অগ্রে আঘাত করিয়া ক্রমে ক্রমে চারিটী তারে আঘাত করিয়া যাইবে।

তাম্বুরার উদারার খরজের তারটী মুদারা ও তারা খরজ তারদ্বয়ের অর্থাৎ জুড়ির তারের অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ স্থূল হয়; এবং উদারার পঞ্চমের তারটী জুড়ির তারের অপেক্ষা, প্রায় দেড়গুণ পরিমিত স্থূল হয়। তাম্বুরুর চারিটী তার লইয়া এই ব্যবস্থা। কিন্তু তাম্বুরুর এই চারিটী তার বাঁধিবার নিয়মেরও ব্যতিক্রম দেখা যায়। শুনিয়াছি কাশি মল্লিক মহাশয়ের বাড়ীতে একজন এক তাম্বুরু তৈয়ারি করিয়া তাহা চড়াইয়াছিল পাঁচটী তারে, তাহাতে ডানদিকে একটা মধ্যম বেশী থাকিত।

যাই হোক সাধারণতঃ চারিটী তারেই তাম্বুরু বাঁধা হইয়া থাকে। এই চারিটী তারের নির্ম্মাণ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। কেহ বলেন খরজের জুড়ির দুইটী তার পিত্তলের; নিম্ন খরজটীও পিত্তলের, একটী

কেবল যাহা বাকি রহিল তাহা ইস্পাতের; আবার কেহ বলেন মাঝের দুটী ইস্পাতের আর পাশের পিত্তলের। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে উইলার্ড বলেন একটী পিত্তলের আর অবশিষ্ট ইস্পাতের। যা হোক আমরা মাঝের দুটী তারকে ইস্পাতের আর পাশের দুটী তারকে পিত্তলের বলিয়া ধরিলাম।

এই পিত্তলের তার কেহ কেহ আবার রূপারও করিয়া থাকে। সোণার করে না। একজন প্রসিদ্ধ গায়কের নিকট শুনিয়াছি তিনি বলেন "সোণার কে করিবে? সোণার তারে আওয়াজও তেমন নয় রূপার তারে আওয়াজ বেশ হয়।" আমার বোধ হয় সোণার তারের সম্বন্ধে এটা তাঁহার একটা কল্পনা মাত্র। যদি রূপার তারে হয় তবে সোণার তারে করিলে আওয়াজ কেন শোনা যাইবে না? আসলে সোণার কেহ করে নাই বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার সোণার তারের উপর ঐরূপ ধারণা। আমার তো বোধ হয় রৌপ্য নির্ম্মিত তারে যদি বেশ সুর হয়, তবে সুবর্ণ নির্ম্মিত তারেও বেশ আওয়াজ হইবে। এ পর্য্যন্ত কেহ করে নাই এই জন্য অবশ্য কিছু নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সঙ্গীতজ্ঞ ধনী সন্তানদিগের মধ্যে তাম্বুরায় সোণার তার লাগাইতে কেহই চেষ্টা করেন নাই। এ খেয়াল কাহারো প্রাণে উদয় হয় নাই।

এতক্ষণ তাম্বুরার তারের বিষয় বলা হইল এইবারে তাহার অন্যান্য অঙ্গের বিষয় বলি; মোটের উপর শুষ্ক অলাবু ও কাষ্ঠের সাহায্যে এই তাম্বুরা যন্ত্র নির্ম্মিত হয়। তাম্বুরুর অলাবুকে চলিত ভাষায় বস বলে; বসের উপরস্থ তক্তাকে তবলী কহে; তবলীর উপরস্থ ক্ষুদ্র কাষ্ঠফলককে সোয়ারি কহে এবং সোয়ারির উপরস্থিত সূত্র বা রেশম গুলিকে জোয়ারি কহে। বসের সঙ্গে লিপ্ত বক্রভাবাপন্ন কাষ্ঠ খণ্ডটার নাম ঘাড়ি; ঘাড়ির উপরস্থিত দারু দণ্ডটার নাম দণ্ড।

তাম্বুরুর চারিটী তারের সুর ঠিক করিবার চারিটী কাণের সমীপস্থিত কাষ্ঠ ফলককে আড়ি বলে; তাম্বুরুর সোয়ারির নিম্নস্থিত চারিটী গোলাকার কাচ পদার্থকে মানকা বলে। তাম্বুরুর দণ্ডের বা ডাণ্ডীর নিম্নস্থিত সমস্ত পশ্চাতের অংশকে তুম্ব বা তুম্বী কহে। তাম্বুরুর কাষ্ঠাংশ প্রায় সেগুণের হয় আর তাহার তুম্বাংশ অলাবুর। এই শুষ্ক অলাবু নির্ম্মিত



তুম্ব ভাগটাই যেন তাম্বুরুর শ্রেষ্ঠাংশ। নায়ক গোপাল তাম্বুরু জয় করিয়া এই তাম্বুরুর একেকটী তুম্বী,—সর্ব্বশুদ্ধ ছয়টী তুম্বী—নিজের কাছে জয়চিহ্ন স্বরূপ রাখিয়াছিলেন। এই তুম্ব যত ফুলো ও গোলাকার হয়, ততই ভাল। এই জন্য অলাবুকে সযত্নে বাঁধিয়া বুঁধিয়া রাখিয়া দিতে হয়, আর যাহাতে বাড়ে তাহার চেষ্টা করিতে হয়। এই তুম্ব কাঠেরও করা যায়, কিন্তু কাঠের করিলে আওয়াজ খারাপ হয়। কাঠের তৈয়ারি করিলে বেশ তৈয়ারি করিতে পারা যায়, কিন্তু তেমন আওয়াজ হয় না। একজন বিশিষ্ট গায়কের মুখে শুনিয়াছি যে বিখ্যাত মহাভারতের অনুবাদক ৺কালি প্রসন্ন সিংহ মহাশয় স্বাভাবিক অলাবুর তুম্বের অনুকরণে কাগজের তুম্ব প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাহা তাঁহার বৃহৎ অট্টালিকাস্থ বৈঠকখানার মজলিসে আনা হইয়াছি[illegible]ত [illegible]য়ে গাওনাও হইয়াছিল। কাগজের তুম্ব অনেকটা শুষ্ক অলাবু[illegible]কাছি যায়; কিন্তু কাঠের করিলে সেরূপ হয় না।

৺কালিসিংহ মহাশয়ের [illegible]মক কলাবতী বীণার এরূপ কাগজের তুম্বী নির্ম্মাণের চেষ্টার জ[illegible] সঙ্গীত সমাজ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। কারণ প্রকৃতি হইতে সকল সময়ে যদি তুম্বের উপযুক্ত অলাবু না পাইলে, তাহা হইলে তখন মনুষ্যের কৃতিত্বের আবশ্যক।

মহাভারতের জন্য তিনি সমস্ত সাহিত্য জগতে যেমন ধন্যবাদের পাত্র সেইরূপ কলাবতী বীণা তাম্বুরার কাগজের তুম্বের জন্য কলাবত জগতে তিনি ধন্যার্হ। এই চেষ্টা তাঁহার সাঙ্গীতিক উন্নতির চেষ্টার পরিচায়ক। সাহিত্যের ন্যায় সঙ্গীতের উন্নতিতেও তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ছিল। এই হেতু সঙ্গীতের দিক হইতে তাঁহাকে ভালরূপে সম্মান দিবার জন্য এই সঙ্গীত প্রবন্ধের সঙ্গে তাঁহার একটী চিত্রও সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিলাম।

তাম্বুরা ও ৺কালিসিংহ মহাশয়ের কথা বলিয়া শেষে উপসংহারে আরও দুএক কথা সাধারণকে বলিতে ইচ্ছা হইল। সে কথা এই;—

সৌভাগ্য বশতঃ ৺কালিসিংহ মহাশয়ের প্রাসাদসম বাড়ীতে সঙ্গীতের উন্নতির জন্য সঙ্গীত চর্চ্চার জন্য এবং তজ্জনিত আনন্দ লাভের জন্য একটী সঙ্গীত সমাজ নামে বৃহতী সভা স্থাপিত হয়। বাটীটী সঙ্গীত সমাজের

উপযুক্ত স্থান ছিল কিন্তু না জানি কি মনোমালিন্যে তাহার মধ্যে এক বৎসর না যাইতে যাইতে বিবাদ বিসম্বাদের সূত্রপাত হইতে লাগিল। এক বৎসর না শেষ হইতে হইতেই ক্রমে তুমুল সংগ্রাম ঈর্ষা ও হিংসা আরম্ভ হইল। কলাবিদ্যা সঙ্গীতের পরিবর্ত্তে তাহার সভ্য মেম্বরদিগের মধ্যে কলহ ইঙ্গিত চলিতে লাগিল। ভিতরে ভিতরে সভ্যদিগের মধ্যে মহা দলাদলি হইয়া উঠিল। ইহাতে আর সঙ্গীতের উন্নতি হইবে কি প্রকারে? স্বদেশে সঙ্গীতের উন্নতিকামনা করিলে সকলের উদারচিত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। ক্ষুদ্র মনে সঙ্গীত বিদ্যা স্ফূর্ত্তি পায় না। উদারচিত্তে সঙ্গীতের উন্নতি প্রতিজনে পৃথকভাবে, দশজনে মিলিয়া যে কোন শুভ উপায়ে করা উচিত।

সঙ্গীতের উন্নতিতে কেহ কাহারোও প্রতি হিংসা না করা উচিত। আমি সঙ্গীত সম্পর্কীয় দুএকটী প্র[illegible] প্র[illegible] গায়ক সদারঙ্গের অমূল্য বাক্যে উদ্বোধিত করিয়াছিলাম এ[illegible]ঙ্গীত সমাজের বর্ত্তমান কলহ কোলাহলের জন্য ক্ষুব্ধচিত্তে সমস্ত [illegible] সমাজকে সদারঙ্গের অমূল্য বাক্যে উদ্বোধিত করিতেছি। "খে[illegible]াহেলে দূর করনে তব স্ফুর গিয়া বিদ্যা।" ক্ষুদ্রমন অগ্রে দূর কর তবে [illegible]ত বিদ্যা স্ফূর্ত্তি পাইবে সহজায়ত্ত হইবে।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।



জড়ের সাধারণ গুণ। *

পূর্ব্ব প্রস্তাবের শেষে বলা হইয়াছিল, রসায়নের আগে জড়ের সাধারণ গুণ ও তাপতড়িৎ প্রভৃতি বর্ণনা করিব। জড় পদার্থের সাধারণগুণ ও প্রকৃতি আলোচনা করিতে গেলে দেখিতে পাইবে, যেমন ইহার ভিতর পরীক্ষার বিষয় অনেক আছে, তেমনি ইহার ভিতর অনেক অনুমান-সিদ্ধ বিষয়ও আছে। জড় পদার্থ কাহাকে বলে, এই প্রশ্নের উত্তরে যদি বলা যায় যে, যে কোন বস্তু বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় তাহাই জড়পদার্থ ; পঞ্চেন্দ্রিয়ের কোন একটা ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য যাহা তাহাই জড়পদার্থ—যেমন এই দ্রব্য দর্শন দ্বারা জানিতেছি এই জন্য ইহা জড়পদার্থ, তাহাতে কেহ কেহ বলেন যে, এই লক্ষণে ভ্রম আছে। আয়নার ভিতর যখন প্রতিবিম্ব দেখে, বালকেরা তাহার পশ্চাতে হাত দিয়া তাহাকে ধরিতে যায় ; কিন্তু বাস্তবিক তো সেখানে কিছু নাই। সুতরাং ঐ লক্ষণ অনুসারে জড়পদার্থ নিরূপণ করা যায় না। এই জন্য পণ্ডিতেরা আর এক লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন—এক ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু যদি অন্য ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলেই সেই পদার্থের যাথার্থ্য নিরূপণ হইবে। যেমন, এই দ্রব্যটী দর্শন ও স্পর্শ দ্বারা গ্রাহ্য, ইহার উপরে আর কথাটী কহিবার উপায় নাই। কোন কোন স্থলে এক বস্তু পঞ্চেন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য হয়। দর্শন দ্বারা কোন বস্তু দেখিয়া তাহাতে যদি অপ্রত্যয় থাকে, স্পর্শ দ্বারা তাহা অপনীত হয় ; অতএব দর্শন স্পর্শ দ্বারা যাহা একদা গ্রাহ্য হয় তাহাই যথার্থ,—এই লক্ষণেও ব্যভিচার আছে। সূর্য্যকে আমরা দেখিয়া আসিতেছি, কিন্তু তাহাকে স্পর্শ দ্বারা জানিতে পারি না—সূর্য্যকিরণকে স্পর্শ করিতেছি

* ৯ বৈশাখ, রবিবার ১৭৯৫ শকে লিখিত।

বলিয়া কিছু সূর্য্যকে স্পর্শ করিতেছি না—অতএব দ্বিতীয় লক্ষণেও সকল বস্তুকে পাওয়া যায় না।

যদি আর একটী লক্ষণ করিয়া লই, তাহা হইলে এই করিতে পারি যে, বাহ্যেন্দ্রিয়ের একটী দ্বারাই হউক, দুইটী দ্বারাই হউক, স্থাননির্ব্বিশেষে, কালনির্ব্বিশেষে ও মনের অবস্থানির্ব্বিশেষে যাহাকে একই দেখিতে পাই তাহাই যথার্থ এবং এই লক্ষণ-নির্দ্দিষ্ট গুণের তারতম্যানুসারে বস্তুর বাস্তবিকতার প্রতি প্রত্যয় বা সন্দেহ হয়।

যে পদার্থকে, কি এখানে কি ওখানে, যেখানেই থাকি না কেন, কি আজ কি কাল প্রতিক্ষণেই, কি মনের ভাল অবস্থায় কি মন্দ অবস্থায়, কি ব্যস্ততার অবস্থায় কি স্থিরাবস্থায় একই রূপে দেখিতে পাই তাহাকেই যথার্থ বস্তু বলিতে হইবে, ইহাই যদি বস্তুর লক্ষণ হয় তাহা হইলে এই লক্ষণ এত গুরুতর হইয়া পড়িল যে, পরমেশ্বর ভিন্ন আর কোন বস্তুতে প্রযুজ্য হইতে পারে না; পরমেশ্বরই একমাত্র অপরিণামী বস্তু। যাহাকে এক সময় দেখিতে পাইলাম, আর এক সময় দেখিতে পাইলাম না, তাহাকে পদার্থ বলিয়া সন্দেহ থাকিতে পারে। ইহার দৃষ্টান্ত—আয়নার ভিতর প্রতিবিম্ব; আয়নার নিকটে মুখ লইয়া গেলে প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলাম, মুখ সরাইলে আর দেখিতে পাইলাম না। আবার, এক সময় এক রকম দেখিলাম, আর এক সময় আর এক রকম দেখিলাম তাহা হইলেও বিশ্বাস ঠিক হয় না। বস্তুতে পরিবর্ত্তন যত কম হয়, তত তাহাতে প্রত্যয় হয়। ভেল্কীতে স্থান, কাল ও বস্তুগত অত্যন্ত পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাহাতে আমরা তত বিশ্বাস স্থাপন করি না।

আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারাই জড় পদার্থ ঠিক করি বটে, কিন্তু তাহার নিশ্চয়তা স্থাপনের নিমিত্ত স্থান, কাল ও অবস্থানির্ব্বিশেষে যতটুকু হয় একই ভাবে দেখা আবশ্যক করে; তবে তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। মরুভূমিতে মরীচিকা দ্বারা যে প্রতারিত হয় তাহাও এই কারণে যে, মরীচিকাকে প্রথমে এক স্থানে দেখা যায়, সেখানে গেলে আর তাহাকে সেই স্থানে দেখা যায় না, তখন আবার তাহা দূরে সরিয়া যায়; সুতরাং দুই তিনবার এইরূপ ঠকিয়া আর তাহার যাথার্থ্যে বিশ্বাস থাকে না

অর্থাৎ দূর হইতে যেরূপ দেখা যাইতেছে, নিকটে গেলে তাহা যে সেইরূপেই প্রাপ্ত হইব তাহা নহে; আবার উহাকে প্রাতঃকালে দেখিতে পাইব না, সন্ধ্যার সময়ও দেখিতে পাইব না, কিন্তু মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যকিরণ যখন প্রখর হয় তখনি তাহাকে দেখা যায়; আবার যাহারা তৃষ্ণাতুর হয় তাহারাই হয়তো উদ্যান জলাশয়াদি অধিক দেখিতে পায়। সুতরাং মরীচিকা ভ্রমমাত্র দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু তাহা কেবলি যে ভ্রম তাহাও নহে; বাস্তবিক বায়ু উত্তপ্ত হইয়া সূর্য্যকিরণকে এরূপ বিখণ্ডিত (refract) করে যে, সেই সূর্য্যের কিরণ চক্ষে পড়িয়া নানা প্রকার ছবির আকার ধারণ করে; কিন্তু যেরূপ ছবি চক্ষে দেখিতে পাই সেরূপ কোন পদার্থ সেখানে থাকে না।

বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারাই জড়পদার্থ চেনা যায়; ইহার সঙ্গে সঙ্গে যতদূর হইতে পারে, স্থানের নির্ব্বিশেষতা, কালের নির্ব্বিশেষতা ও কখনো কখনো মনের নির্ব্বিশেষতা হইলে তাহার সত্তায় বিশ্বাস দৃঢ় হয়। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই লক্ষণ, সম্যক্‌ভাবে জড় পদার্থে খাটে না। এই লক্ষণ পরমেশ্বরেতেই পর্য্যবসিত হয়; তিনিই দেশ কাল পাত্রে অপরিবর্ত্তিত স্বভাবরূপে স্থির হইয়া আছেন, আর সকলই লক্ষণের অংশ মাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। যে যত এই লক্ষণের ভাগ অধিক পায় তাহাকে আমাদের তত অধিক সত্য বলিয়া বোধ হয়। যেমন, মরীচিকা বা ভেল্কী অপেক্ষা ক্ষণস্থায়ী পুষ্পকে অধিক সত্য বলিয়া বোধ হইবে; পুষ্প অপেক্ষা প্রাচীরকে, প্রাচীর অপেক্ষা পর্ব্বতকে, পর্ব্বত অপেক্ষা পৃথিবীকে, পৃথিবী অপেক্ষা সৌর জগৎকে, সৌর জগৎ অপেক্ষা ব্রহ্মাণ্ডকে এবং ব্রহ্মাণ্ড অপেক্ষা পরমেশ্বরকে অধিক সত্য বলিয়া বোধ হইবে।

কিন্তু আমাদের এই লক্ষণ দ্বারা জড়পদার্থ আমাদের নিকট অধিক সত্য বা কম সত্য বলিয়া যেরূপই বোধ হউক না, যাহা সত্য তাহা সত্যই থাকিবে। উল্কাপাত দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হয় বলিয়া উহা কি সত্য নহে? উহাও সত্য—কত উল্কাখণ্ড পৃথিবীতে পতিত হইয়া লোকের প্রত্যক্ষগোচর হইয়াছে। ক্ষণপ্রভা ক্ষণমাত্র নেত্রগোচর হয় বলিয়া কি উহা সত্য পদার্থ নহে? এক ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইলেও তাহা সত্য পদার্থ

হয়; কেবল ঐরূপ ক্ষণিক ঘটনার সময় জ্ঞানক্রিয়া দ্বারা বিবেচনা করিয়া লইতে হইবে যে, উহা কাল্পনিক বা বাস্তবিক। যেমন আমাদের চক্ষুর যদি কোন দোষ না থাকে এবং আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে, তবে উল্কাপাত হইলে তাহা কেননা আমরা উল্কাপাত বলিয়া বিশ্বাস করিব—বিশেষত, ঐরূপ উল্কাপাত যখন আরো অনেকবার হইতে দেখিয়াছি। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়, আর যদি তাহাতে ক্ষণপ্রভা দীপ্তি পায় তাহাতে আমরা বিশ্বাস করি; কারণ, একত, যখনি মেঘ হয় তখনি বিদ্যুৎ দেখিতে পাই; দ্বিতীয়ত, বিদ্যুৎ যেরূপে উৎপন্ন হয় তাহার অনেকটা আমরা জানি এবং বিদ্যুৎ প্রস্তুত করিতে পারি। যে দ্রব্য কখন দেখি নাই, কখন শুনি নাই, এমন কোন দ্রব্য হঠাৎ প্রত্যক্ষ হইলে সংশয় হইতে পারে কিন্তু জ্ঞান দ্বারা সম্যক্ আয়ত্ত করিতে পারিলে সেই সেই সংশয় দূর হয়।

কেহ কেহ বলেন যে বাস্তবিক পদার্থ আমরা দেখিতে পাই না, কেবল গুণ দেখিতে পাই; যেমন, এই তক্তার কালো গুণটুকু চক্ষে দেখিতে পাই; ইহার বন্ধুরতা হাতের দ্বারা স্পর্শ করিয়া জানিতে পাই; ইহা হইতে নির্গত শব্দগুণ কর্ণ দ্বারা শুনিতে পাই। তাঁহারা বলেন যে ইন্দ্রিয় দ্বারা কেবল বস্তুর গুণ নিরূপণ হয় কিন্তু বস্তু নহে। কিন্তু গুণ যে আধারে থাকে, সেই আধার বস্তু তো? গুণ আধারে দেখিতে পাই অথবা গুণের সহিত বস্তুকে একত্র দেখি, ইহা একই কথা। যেমন কালো গুণ দেখিতেছি, তেমনি ঐ কালো গুণেতে আধার বা বস্তু জড়িত দেখিতেছি।

বস্তুত যদি জড়-জ্ঞানকে বিভাগ করিয়া দেখিতে যাই তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, ইন্দ্রিয় তাহার আংশিক ভাগ প্রকাশ করে এবং আমাদের মনও আংশিক ভাগ তাহাতে অর্পণ করে। এই উভয়ের রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারাই যেন আমরা জড়পদার্থ অবগত হই। আমাদের মনের প্রতিঘাতে মন হইতে ভিন্ন বাহ্য পদার্থের জ্ঞান হয়। ছেলেবেলায় শিশু যাহা কিছু দেখে, সব যেন মনেতেই দেখে; ঘর দ্বার যাহা কিছু দেখে, বাহিরে যে এই সকল দেখিতেছে তাহা তাহার বোধ হয় না; তাহার

মনই যেন তাহার নিকট ঐ সকল হইয়াছে। তাহাকে আঘাত করিলে আঘাত করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না; কিন্তু তাহার মনেতে ক্লেশ উপস্থিত হইল, সেই টুকুই সে জানে। বড় হইলে ক্রমে বুঝিতে পারে, মনতো ঐ সকল ঘটনার কারণ নহে, অতএব মনের বাহির হইতে ঐ সকল কারণ আসিতেছে; এইরূপে আপনার সঙ্গে প্রতিঘাত দ্বারা শিশু ক্রমে বাহ্য পদার্থ জানে।

কিন্তু বাহ্যপদার্থের যেটুকু ইন্দ্রিয়গম্য সেটুকু গুণ, আমাদের মন তাহাতে আধার প্রদান করে। যেমন, তক্তায় কালটুকু চক্ষে দেখিতেছি কিন্তু কাল এই বস্তু, ইহা মন বলিতেছে—তক্তার রংটুকু চক্ষে পড়িতেছে। তক্তাখানি যে কঠিন, তাহা হাত বুঝিতে পারিতেছে কিন্তু ইহা যে এতখানি স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে, এই স্থানটুকু মন দিতেছে;—স্থানকে তো হাত স্পর্শ করিতে পারে না, চক্ষু দেখিতে পায় না; আকাশ শূন্য পদার্থ, মন কিন্তু গুণেতে আধার দিয়া ও আকাশ দিয়া আকৃতি ও বিস্তৃতিযুক্ত বস্তুরূপে গ্রহণ করে।

বাস্তবিক মন যে গুণেতে আধার ও আকাশ অর্পণ করে তাহা নহে; যখনি আমরা জড়পদার্থকে জানি তখনি তাহাকে আকাশব্যাপ্য ও আকৃতিবিশিষ্ট বস্তু বলিয়াই জানি। তবে, আমাদের এমন ক্ষমতা আছে যে, বস্তু হইতে গুণকে প্রত্যাহার করিয়া কল্পনাতে আলোচনা করিতে পারি, বাস্তবিক ভিন্ন বলিয়া মনে করিতে পারি না। সে যাহা হউক, মতামত বিভিন্ন থাকিলেও বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা আংশিক স্থাননির্ব্বিশেষে, কালনির্ব্বিশেষে ও মনের অবস্থানির্ব্বিশেষে যে পদার্থ গ্রহণ করি তাহাই জড় পদার্থ। সেই জড়পদার্থ লইয়াই রসায়নের ব্যাপার। অজড় পদার্থ লইয়া রসায়ন-ব্যাপার হয় না। অজড় পদার্থ আত্মা। আত্মা হইতে না কোন রাসায়নিক ব্যাপার সমুদ্ভূত হয়, না জড়ের রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারাই আত্মার উদ্ভব হইতে পারে।

জড়পদার্থ মাত্রেরই সাধারণ গুণ ও বিশেষ গুণ আছে। বিশেষ গুণের ইয়ত্তা নাই; বিশেষ গুণের আলোচনা করিতে গেলে সীমা পাওয়া যায় না। ঈশ্বরে যেমন একতা ও বিচিত্রতা তেমনি তাঁহার সৃষ্ট এক একটি

বস্তুতেও অসীম বিচিত্রতা প্রকাশ পায়—ইহার এই গুণের সঙ্গে ইহার এই গুণ বিশেষ, উহার ঐ গুণের সঙ্গে উহার ঐ গুণ প্রভেদ ইত্যাদি।

বিশেষ গুণ যতদূর পারি পরে আলোচনা করা যাইবে, এখন সাধারণ গুণগুলি মনে করা আবশ্যক। জগতে অশেষবিধ পদার্থ আছে বলিয়া জগতের অশেষবিধ উপাদান বলিলে যেমন অন্যায় হয়, তেমনি জড়পদার্থের নানা প্রকার গুণ রহিয়াছে কিন্তু তাহার মধ্যে কতকগুলি গুণ এক সাধারণ গুণের হয়তো অন্তর্গত; আমরা এইরূপ বিশেষ বিশেষ গুণকে অন্তর্গত করিয়া সাধারণ গুণের বিষয় বলিতে চাহি, তাহা হইলে অধিক স্মরণ থাকিবে।

প্রথম, জড়পদার্থের সাধারণ গুণ এই যে, যে কিছু পদার্থ আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করি, তাহার কিছুই রূঢ়ি বা অযৌগিক একটী পদার্থ নহে কিন্তু পরমাণুর সমষ্টি। যেমন, এই কাগজকে প্রত্যক্ষ কর; ইহা একটী পদার্থ নহে, ইহাকে যে বিচ্ছিন্ন করা যায় না তাহা নহে। এই কাগজে কত আঁশ আছে, এক একটী আঁশ আবার কত অংশের সমষ্টি। ইহাকে লক্ষ লক্ষ ভাগ করিয়া যাওয়া যায়; চরমে এক রকম পরমাণু আছে যাহার আর ভাগ হইতে পারে না, সেই সূক্ষ্মতম পরমাণুর সমষ্টি এই কাগজ। সেইরূপ পরমাণুর সমষ্টিই সমস্ত বস্তু।

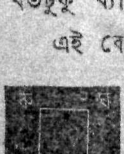
বস্তু বিভক্ত হইয়া ভাগের শেষ যাহা, যাহার আর ভাগশেষ হইতে পারে না, তাহাই পরমাণু। এ বিষয়েও মতান্তর আছে। এই পদার্থকে দশভাগ করিলাম, তাহাকে আবার বিশভাগ করিলাম, তাহাকে আবার চল্লিশভাগ করিলাম, এইরূপে অসীম ভাগ হইতে পারে, তখন তাহার আর অবশিষ্ট থাকে না। যেমন, ৮ কে যদি ২ দিয়া ভাগ করা যায় তাহার ভাগফল হইবে ৪, কিন্তু অনন্ত যদি ভাজক হয় ভাগফল শূন্য হইবে; যথা, ৮÷২=৪, ৮÷৪=২; ৮÷৮=১, ৮÷অনন্ত=০। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা জানা যাইতেছে, ভাজকটা যত ছোট হয় ভাগফল তত বড় হয়, ভাজক যত বড় হয় ভাগফল তত ছোট হয়। একখণ্ড বস্তু (যেমন এই খড়ি খানি) হইল যেন ১০; এই ১০ কে যদি ২০ ভাগ করা যায়, ভাগফল হইবে আধ ($\frac{১}{২}$) অর্থাৎ দুই ভাগের এক ভাগ। ইহাকে যদি ১০০ ভাগ করা যায়, ভাগ-

ফল হইবে ১/১০ অর্থাৎ দশ ভাগের এক ভাগ। এইরূপে ভাজককে বড় করিলে ভাগফল ভগ্নাংশের ভগ্নাংশ হইতে হইতে ক্রমে অনন্ত ভাজক হইলে ভাগফল অনন্তগুণে ছোট হইবে অর্থাৎ শূন্য হইবে, যেমন, ১০÷অনন্ত=০। ইহাই কি সত্য? যদি কিছু না থাকে, তবে কিছু না হইতে কিছু হয় কি প্রকারে? সুতরাং অনন্তগুণে ভাগ বৃথা—ভাগ করিতে করিতে এমন ভাগে পৌঁছান যায়, যে রাশির আর ভাগ হইতে পারে পারে না; সেই সূক্ষ্মাংশের নাম পরমাণু। পরমাণু যদি না থাকে, তবে পরমাণু জড়িত হইয়া বস্তু হইবে কি প্রকারে? অতএব স্থির হইল যে বস্তু পরমাণু সমষ্টি।

ভৌতিক পদার্থ পরমাণুর সমষ্টি, ইহাই হইল প্রথম তত্ত্ব। সেই পরমাণুর আকার আছে, ভার আছে, ক্রিয়া আছে। পরমাণুর গুণেতেই বস্তুর গুণ প্রকাশ পায়। নির্গুণ যদি পরমাণু হইত, বস্তুও নির্গুণ হইত; পরমাণু কারণ, ইহা কার্য্য; কারণের গুণ না থাকিলে কার্য্যের গুণ থাকিতে পারে না।

ভৌতিক পদার্থের আর একটী সাধারণ গুণ বিস্তৃতি। বিস্তৃতির অর্থ স্থান ব্যাপিয়া থাকা। স্থান কাহারে বলে? এই বায়ু যে আছে, ইহা স্থান নহে, এই যে দেওয়াল আছে, ইহাও স্থান নহে; ইহারা স্থানেতে আছে মাত্র। এই গৃহ হইতে সমস্ত যদি বাহির করিয়া লওয়া যায় তখনই স্থান রহিল—শূন্য. যাহা পড়িয়া থাকে তাহাই স্থান। সেই স্থান ব্যাপিয়া থাকা, ইহা একটী ভৌতিক গুণ। যেমন খড়ি এখানে রহিয়াছে, ইহা যত বড় ততটুকু আপনার মতন স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ইহা যেটুকু স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে, সেই স্থানে আর কিছু নাই। যে বস্তু সেই স্থান যতটুকু ব্যাপিয়া থাকে, তাহাই তাহার আকার।

এই বোর্ডের এই সমস্তটাই যেন স্থান; তাহার মধ্যে আমি কখগঘ আঁকিলাম।



কখগঘ, বোর্ডের এইটুকু স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ঐ স্থানটুকুর যাহা প্রান্তভাগ, সেই প্রান্তভাগের সমষ্টি লইলেই উহার আকার পাওয়া গেল। কখগঘ হইল চতুষ্কোণ, কোনটা ত্রিকোণ হয়, কোনটা গোল হয়। স্থানব্যাপিত্ব হইতেই আকার হয়।

আবার যেমন এই বইটী বইয়ের মতন স্থান ব্যাপিয়া রহিয়া ছে, তেমনি

ইহার সূক্ষ্মতম পরমাণুও কি স্থান ব্যাপিয়া নাই—অবশ্য আছে। যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুর অংশে বই হইল, তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থান দ্বারা এত বড় স্থান হইল। ব্যাপিত্ব হইতে আকার হয়। স্থূল পদার্থ যেমন স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে, জলও তেমনি স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে; অণুও স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তাহাতেই বিভিন্ন আকার হইতেছে।

আকার দুই রকমে হয়; এক, স্থানের যেমন যেমন সীমা, বস্তুর তেমনি তেমনি আকার হয়; দ্বিতীয়তঃ, পরমাণুর আকার যেরূপ বস্তুর সেইরূপ আকার হয়। পরমাণুর আকার কি দেখা যায়? তাহার আকার চক্ষে দেখা যায় না বটে কিন্তু প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে। রাজমিস্ত্রী যখন গোলাকার থাম গাঁথে, গোলাকার ইট দিয়া গাঁথে বলিয়া থাম গোলাকার হয়; বইটা চতুষ্কোণ, ইহাতে স্থূলতা আছে—ইহার পাতাগুলিও চতুষ্কোণ এবং তাহাতে অল্প পরিমাণে স্থূলতা আছে; পাতের চতুষ্কোণতা ও স্থূলতা থাকাতেই পাতের সমষ্টি যে এই বই ইহাও চতুষ্কোণ ও স্থূল হইয়াছে। যদি এই বইয়েতে আরও পাত দেওয়া যায়, বই আরও স্থূল হইবে। সেইরূপ পরমাণুপুঞ্জ যেমন যেমন স্থান লইয়া থাকে, বস্তুও তেমনি আকার ধারণ করে। যদিও দেখা যাইতেছে যে এই খড়ির আকার একরকম, এই টেবিলের আকার একরকম, ইহা আর কিছুই নহে; কেবল পরমাণু যেরূপে স্থানে সাজান রহিয়াছে, সেই অনুসারে ইহাদের আকার বিভিন্ন হইয়াছে।

আবার এই টেবিলটাকে বেশ মসৃণ ও সমতল দেখিতেছি। বাস্তবিক ইহা মসৃণও নহে, সমতলও নহে কিন্তু কেবলই উচ্চনীচ; প্রবল অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে গোল গোল 'ল'এর মত (⌒⌒⌒) উচ্চ নীচ দেখা যাইবে। এই বইটা রহিয়াছে, ইহার ধার আছে বলিয়া বোধ হইতেছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার ধার নাই, ধারটাও ঐরূপ গোলগোল। আবার দেখা যায়, জগতের প্রায় সকল বস্তুই গোলাকার—গ্রহতারা চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী হইতে ক্ষুদ্র জলবিন্দু পর্য্যন্ত সকলই গোল; গাছ গোলপ্রায়; দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে মাথা, নাড়ী প্রভৃতি সকলই গোল। জলকে সমতল বলিয়া বোধ হয় কিন্তু তাহার উপরিভাগও তরঙ্গের ন্যায়

গোল; সেই জলের আবার এক বিন্দু যদি উঠাইয়া ধরা যায় তাহাও গোল। পারা ধাতু, তাহাকে যদি টেবিলের উপর ফেলিয়া দাও তাহা গোল গোল হইয়া গড়াইয়া যাইবে।

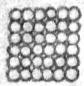
যদি কোন বস্তু চতুষ্কোণ হয়, তাহার ঠিক ছুঁচল কোণ থাকিবে, তাহার ধার থাকিবে; সেই ধারকে এইরূপে (˃) আঁকা যাইতে পারে। কিন্তু এই রকম কোণ কি ধার জগতের মধ্যে দেখা যায় না। যেখানে (˃) এমনি কোণ আছে সেই কোণের মধ্যে (⌒) এমনি গোলত্ব আছে। অতএব ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে পরমাণুর প্রাকৃতিক আকার গোল।

পরমাণুর পরিবর্ত্ত হইতে পারে না, তাহার ভাগও হইতে পারে না, তাহাকে চাঁচাও যায় না; ঈশ্বর যে আকার প্রদান করিয়াছেন তাহাই আছে—সেই আকার গোল।

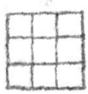
কেহ কেহ বলেন, ভিন্ন প্রকার পরমাণুর ভিন্ন আকার। যেমন মিশ্রিতে যে দানা (crystal) বাঁধিয়া যায় বা জলে লবণ ফেলিয়া দিলে জল উবিয়া গেলে তাহাতে যে দানা বাঁধে, পরমাণুর যে পার্শ্ব আছে সেই সকল পার্শ্ব মিলিয়াই দানা বাঁধে; পরমাণুর সংহতি দ্বারা যখন দানা বাঁধে তখন পরমাণুরই আকার দানার আকারের ন্যায় অর্থাৎ পরমাণুর ধার আছে এবং কোণ আছে। কিন্তু অণুবীক্ষণ দ্বারা দানার প্রতি পার্শ্ব দেখিলে সেখানে 'ন'এর মত উচুনীচু আছে দেখা যায়; কেবল চক্ষু দ্বারা যেখানে ছুঁচল বোধ হয়, তাহার ভিতরেও 'ন'এর ন্যায় গোলভাব আছে। আবার দেখা যায় যে একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পড়িলে ভিন্ন ভিন্ন রকমের দানা বাঁধে। সুতরাং পরমাণুর আকার দানার আকারের মত নহে, কেননা পরমাণুর আকার পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না; তবে যে দানা বাঁধে, তাহা কেবল গোল পরমাণুর ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে সন্নিবেশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব পরমাণুমাত্রের ঈশ্বরপ্রদত্ত আকার গোল; গোলত্ব হইতে বিভিন্ন আকার হইতেছে, তাহার মধ্যেও গোলত্ব রহিয়াছে।

এখন প্রশ্ন উদয় হইতে পারে, পরমাণু যদি গোল হয় তবে বস্তু সকল কিরূপে চতুষ্কোণ হয়, ত্রিকোণ হয়? কেল্লাতে যেরূপে গোলা সাজায় তাহা

হইতে দেখা যায়, এক গোল হইতে সকল প্রকার আকার হইতে পারে;



গোলা দ্বারা চতুষ্কোণও হয়, আবার এই চতুষ্কোণের প্রত্যেক অণুই গোল এই জন্য ঐ সকল গোল অণু যদি একত্র থাকে, তাহা হইলেই বস্তুর উপরিভাগ সকল 'ল' আকার, (⌒⌒⌒)



এই প্রকার, দেখিতে পাইবে। যদি পরমাণু চতুষ্কোণ হইত তাহা হইলে উচ্চনীচ থাকিবার প্রয়োজন হইত না, আবার গোল অণু দ্বারা ত্রিকোণ হইতে পারে, এই সকল



যুক্তি দ্বারা স্থির হইল পরমাণুর আকার আছে। তাহা সম্ভবত গোল; তদ্দ্বারা বিভিন্ন রকম আকার প্রস্তুত হয়; বস্তুগত আকার সকলের বিভিন্নতার মধ্যে সাধারণত্ব দেখা যাইতেছে গোল।

প্রথম অণুসমষ্টির কথা হইল; অণুসমষ্টির পর বিস্তৃতি, বিস্তৃতির পর আকৃতি এবং আকৃতির পর পরমাণুর আকৃতি গোল এই পর্য্যন্ত বলা গেল। ভৌতিক পদার্থের আর একটী সাধারণ গুণ আকর্ষণ। যেমন বিস্তৃতি আকৃতি সকল বস্তুতে আছে তেমনি সকলেরই আকর্ষণ আছে। আকর্ষণ কাহাকে বলে? এক বস্তু অন্য বস্তুকে আপনার দিকে যে শক্তির দ্বারা টানিয়া লইয়া আসে তাহার নাম আকর্ষণ। সেই আকর্ষণকে কয়েক প্রকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যেমন, যোগাকর্ষণ, মধ্যাকর্ষণ, কৈশিকাকর্ষণ, রাসায়নিক আকর্ষণ, চুম্বকাকর্ষণ, তড়িদাকর্ষণ। বস্তুত এই সকল বিভিন্ন আকর্ষণ নহে। সমস্ত বস্তুর একই মাত্র আকর্ষণ আছে এই টুকু বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইল; কিন্তু যখন বিভিন্ন নাম আছে, তখন আকর্ষণের পৃথক্ নামযুক্ত প্রত্যেক বিভাগের বিবরণ বলিয়া যদি তাহার পরে দেখান যায় যে আকর্ষণ মাত্রেই এক, তাহা হইলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

আমরা আকর্ষণের সামান্য চিহ্ন অনেক দেখিতে পাই। যেমন, একটী কাঠিতে এক বিন্দু জল এবং অপর এক কাঠিতে আর এক বিন্দু জল ধরিয়া যদি পরস্পরের খুব নিকটে লইয়া আসা যায়, ক্রমে ক্রমে নিকট হইতে দুই বিন্দু জল মিশিয়া এক হইয়া যায়। বিস্তৃত মুখবিশিষ্ট পাত্রে কিম্বা পুষ্করিণীতে কিম্বা সমুদ্রে বিবিধ জিনিষ ভাসাইয়া দিলে, জল নিস্তব্ধ

থাকিলেও সকল গুলি আসিয়া একস্থানে জড়ো হইবে। আরও দেখ, গোলা রহিয়াছে, ছাড়িয়া দিলে; অবিলম্বে মাটিতে পড়িয়া গেল। ইহ দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, ইহা উহাকে টানিতেছে, উহা ইহাকে টানিতেছে, গোলাতে যত পরমাণু আছে, গোলা তত বলে পৃথিবীকে টানিতেছে, পৃথিবীতে যত পরমাণু আছে সে তত বলে ইহাকে টানিতেছে অর্থাৎ পৃথিবীর প্রতি পরমাণু ইহার প্রতি পরমাণুকে টানিতেছে, ইহারও প্রতি পরমাণু পৃথিবীর প্রতি পরমাণুকে টানিতেছে।

এই পরমাণুর ন্যূনাধিক্য হেতু আকর্ষণের গতির ন্যূনাধিক্য হয়। যদি এই বস্তুর পরমাণু এক হয়, পৃথিবীর পরমাণু একশত হয় তাহা হইলে পৃথিবী ইহাকে শতগুণ বলে টানিবে; ইহা পৃথিবীর দিকে কেবল শত পদ অগ্রসর হইবে, পৃথিবী ইহার দিকে কেবল $\frac{1}{100}$ উন্মুখ হইবে। যদি একটা সূর্য্য পৃথিবীর কাছে আসে, তাহা হইলে সূর্য্য পৃথিবীতে না আসিতে আসিতেই পৃথিবী সূর্য্যেতে গিয়া লাগিয়া যাইবে। আমরা পৃথিবীতে হাঁটিবার সময় এক পা উঠাইয়া লইয়া অগ্রসর হইতেছি; আমরা পৃথিবীর সঙ্গে লগ্ন রহিয়াছি; আমরাও আকর্ষণ করিতেছি পৃথিবীকে, পৃথিবীও আকর্ষণ করিতেছে আমাদিগকে—পরস্পর লাগালাগি রহিয়াছি।

এমন দৃষ্টান্ত আনা যাইতে পারে, যাহাতে আকর্ষণের প্রতি সন্দেহ হইতে পারে। তাহাও উল্লেখ করিতেছি, যেমন, গাছের পাতা ঊর্দ্ধদিকে যায়, ধূম ঊর্দ্ধদিকে যায়। উহাদের যে আকর্ষণ নাই তাহা নহে; পাতা যে ঊর্দ্ধদিকে যাইতেছে, তাহার কারণ, পাতার সঙ্গে পৃথিবীর যে আকর্ষণ তাহা অপেক্ষা বায়ুর বেগ বেশী, এই জন্ম তাহাতে বায়ুতে উড়াইয়া লইয়া গেল।

ধূম যে উপরে উঠে, তাহার কারণ বুঝিয়া উঠা কিছু কঠিন হইবে। ধূম বায়ু অপেক্ষা হাল্‌কা, বায়ু ধূম অপেক্ষা ভারী; সুতরাং বায়ুর মধ্যে ধূম থাকিলে, ধূম যত জোরে পৃথিবীতে আসিতে চাহে, তাহা অপেক্ষা অধিকতর জোরে বায়ু পৃথিবীর দিকে আসিতে চাহে। ধূম হাল্‌কা, ধূম বায়ুকে ভেদ করিতে পারে না, বায়ু ধূমকে ভেদ করিয়া তাহার স্থানে

আসিয়া দাঁড়ায়; বায়ু চেষ্টা করে, যেখানে ধূম রহিয়াছে সেইখানে সে যাইবে। সমস্ত বায়ু যদি ধূমের স্থানে যাইতে চাহে, কাজে কাজেই বায়ু তাহাকে উপরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়, যে পর্য্যন্ত না উপরে যাইতে যাইতে ধূমের ভার আর বায়ুর ভার একরূপ হয়। এই জন্য মেঘকে আমাদের উপরে কতকটা উচ্চে দেখিতে পাই, আবার পর্ব্বতবাসীরা তাহাদের পদ-তলে মেঘ দর্শন করে।

আর এক প্রকার আকর্ষণের চিহ্ন দেখিতে পাই, যখন দুই আয়-তন অজনক (hydrogen) মরুৎ এক আয়তন দহকের (oxygen) সঙ্গে মিলিয়া দুই আয়তন মাত্র জলীয় বাষ্প হইল। কোথায় অজনকের এক রকম গুণ, দহকের আর এক রকম গুণ; এই দুই মিলিত হইয়া কোথায় আর এক জিনিষ, জল হইয়া গেল, যাহাতে তাহার উপাদানের কোন গুণই নাই।

আকর্ষণের আর এক রকম চিহ্ন আমরা দেখিতে পাই, যখন চুম্বক ইস্পাতকে টানিয়া লয়। আর এক রকম আকর্ষণের চিহ্ন দেখি, যখন কাচকে রেশম বা লোমশ কাপড় দিয়া ঘষিলে চুল কি পালক প্রভৃতি আকর্ষণ করে এবং বিকর্ষণ করে।

ইহার মধ্যে যোগাকর্ষণ হইতেছে, একটা বস্তুর মধ্যে অণুতে অণুতে যে আকর্ষণ। এক দ্রব্যের ভিতর যে সকল অণু ঘেঁসাঘেঁসি আছে তাহা-দের মধ্যে পরস্পর আকর্ষণের নাম যোগাকর্ষণ; সন্নিকটস্থিত পরমাণুর পরস্পরাকর্ষণকে যোগাকর্ষণ বলে। এই যোগাকর্ষণ-ভেদে বস্তুর নানা-প্রকার অবস্থা হইতেছে; কোনটা কঠিন হইতেছে, কোনটা নরম হই-তেছে; কোনটা আটার মত হইতেছে; কোনটা তেলের মত হইতেছে, কোনটা জলের মত হইতেছে কোনটা বাষ্পের মত হইতেছে, কোনটা একেবারে বায়ুর মত হইতেছে।

ইহাদের মধ্যে তিন অবস্থাই আসিল; অন্য অন্য অবস্থাগুলি তাহাদের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা। সেই প্রধান তিন অবস্থা, কঠিন, তরল ও মরুৎ অবস্থা। একই বস্তুর হয়তো এই তিন অবস্থা ক্রমান্বয়ে ঘটিতে পারে। কাহারো হয়তো দুই প্রকার অবস্থা ঘটিতে পারে; কোনটা বা একই অবস্থায় থাকে। যেমন, জল তরল অবস্থায় আছে, আর এক সময়ে জমিয়া বরফ

হইয়া কঠিন হইয়া গেল; আর এক সময় বায়ুর অবস্থা পাইয়া নীচে থাকিতে পারিল না, উপরে উঠিয়া মেঘ হইয়া দেখা দিল। আবার, আমাদের এই বায়ু, ইহাকে কোনরূপেই তরল করা যায় না বা কঠিন করা যায় না। আবার, কতকগুলি মরুৎকে শীতল করিয়া ও চাপ দিয়া তরলও করা যায় এবং কঠিনও করা যায়। যেমন, অঙ্গার দ্রাবক (কারবনিক অ্যাসিড) নামক যে মরুৎ, উহাতে শৈত্য ও চাপ প্রয়োগ করিলে উহা ক্রমে ক্রমে তরল ও বরফের ন্যায় কঠিন হয়। ধাতু সামগ্রী স্বর্ণ বা লৌহ খুব কঠিন, তাপ দিলে তাহারা গলিয়া গেল, আবার খুব তাপ দিলে বায়ুবৎ হইয়া চলিয়া গেল। তবে দেখ, যোগাকর্ষণ কম হয় তাপ দ্বারা, আর যোগাকর্ষণের শক্তি বৃদ্ধি পায় শীতলতা বা তাপহীনতা দ্বারা।

৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঝাল কাসুন্দি।

উপকরণ।—ঝুনি সরিষা আধসের, জল পাঁচসের, নুন তিন কাঁচ্চা, হলুদ এক তোলা।

প্রণালী।—সরিষা আনিয়া তাহা ঝাড়িয়া বাছিয়া একটি গাঢ় (গভীর) পাত্রের জলে ঢালিয়া দিবে। ধুইয়া সরিষা গুলি জল হইতে ছাঁকিয়া ছাঁকিয়া উঠাও। জলের তলায় বালি মাটী ইত্যাদি পড়িয়া থাকিবে। একটি কাপড় বিছাইয়া এই সরিষাগুলি তাহার উপরে ছড়াইয়া দিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দাও। ইহা ভালরূপ শুকাইয়া গেলে ঢেঁকিতে কুটিয়া লইতে হইবে। ঢেঁকির অভাবে শিলে কিম্বা হামালদিস্তাতে মিহি করিয়া গুঁড়া করিয়া লইলেও চলিবে। পরে একখানি কুলা বা খুব সরু ছিদ্র বিশিষ্ট চালুনি করিয়া ঝাড়িয়া ফেল। যে গোটা সরিষাগুলি চালুনিতে রহিয়া যাইবে সেগুলি অন্য কার্য্যের জন্য রাখিয়া দিবে। আর মিহিগুঁড়া সরিষাগুলি আলাদা রাখিবে। হলুদগুলিও রৌদ্রে দিয়া গুঁড়াইয়া রাখিবে।

জ্বলন্ত উনানে একটা বড় হাঁড়ি করিয়া পাঁচসের জল চড়াইবে। ক্রমে যখন জল টগবগ করিয়া ফুটিয়া ফুটিয়া অর্দ্ধেক অর্থাৎ আড়াই সের হইবে, তখন সেই জল নামাইবে। এই জল ফুটিয়া ঠিক হইতে প্রায় পাঁচ কোয়া-র্টার লাগিবে।

পাঁচসের জল ধরে এমন একটি নূতন মাটীর তোলো হাঁড়ি আন। এইবারে কাসুন্দি প্রস্তুত কর। সরিষা ও হলুদ গুঁড়া একত্রে মিশাইয়া রাখ। একজন একদিক হইতে অল্প অল্প করিয়া ঐ সব জল ঢাল আর অন্যদিক হইতে আর একজন অল্প অল্প করিয়া সরিষা ঢাল, আর অপর একজন একটি কাঠের ঘুঁটনি দিয়া ঘুঁটিতে থাক। এইরূপে সমস্ত সরিষাগুলি ও সমস্ত জলটুকু মেশান হইলে পর ইহাতে নুন দিয়া আর একবার ঘুঁটিয়া দেবে। হাঁড়ির মুখে একটি পাতলা কাপড় ঢাকা দিয়া ঠাণ্ডা করিতে দাও। বেশ ঠাণ্ডা হইয়া গেলে হাঁড়ির মুখে সরা দিয়া তাহার উপরে কাপড় বাঁধিয়া রাখিয়া দাও। যেদিন কাসুন্দি প্রস্তুত করিবে সেইদিন এবং তাহার পরদিন এই দুদিন রৌদ্রে দিবে না। তৃতীয় দিন হইতে রৌদ্রে দিবে। তৃতীয় এবং চতুর্থ এই দুদিন রৌদ্রে দিলেই কাসুন্দি ঠিক হইয়া যাইবে। পঞ্চম দিনে কাসুন্দি অমনি ঘরেই তোলা থাকিবে। ষষ্ঠ দিনে ব্যবহার করিবার উপযোগী হইবে। এই রৌদ্র টুকু পাইলেই ইহার তিক্ত ভাব চলিয়া গিয়া খুব ঝাল ঝাঁজ বাহির হইবে। তারপর দিন ঘরের ভিতরে রাখিলেই ঈষদম্ল হইয়া যাইবে। এই হিসাবে বেশী উপকরণ লইয়া আরো অধিক পরিমাণে কাসুন্দি করিতে পারা যায়।

ভোজন বিধি।—ইহা লুচি ও কচুরি প্রভৃতি নিমকি খাদ্যের সহিত খাইতে ভাল লাগে। মাংসের চপ, রোষ্ট প্রভৃতির সঙ্গেও দেখিয়াছি ঝাল কাসুন্দি ব্যবহার করিতে পারা যায় না যে এমন নহে।

সচরাচর আমাদের দেশে চৈত্র বৈশাখ মাসে কাসুন্দি করিয়া থাকে। এই সময় নূতন সরিষা হয় আর রৌদ্রের বেশ তেজও হয়।

আনুমানিক ব্যয়।—ঝুনি সরিষা আধসেরের দাম তিন আনা, কয়লা আর নুনে ধর পাঁচটা পয়সা। সর্ব্বশুদ্ধ আনা পাঁচ খরচ হইবে।

শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী।

দুধের হালুয়া।

উপকরণ।—দুধ তিনসের, ঘি সাড়ে সাত ছটাক, খাসা ময়দা দেড় পোয়া, কাশীর চিনি আধসের টাক।

প্রণালী।—একটি বড় কড়ায় করিয়া তিনসের দুধ আগুণে চড়াইয়া দাও। দুই চারিবার খুন্তি দিয়া নাড়িয়া খুন্তি দুধেই ডুবাইয়া রাখিবে, তাহা হইলে আর দুধ উথলিয়া পড়িবে না। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে দেখিবে, একসের দুধ মরিয়া গিয়া প্রায় দুসের দুধ রহিয়াছে; তখন নামাইয়া একটি পাত্রে ঢালিয়া রাখিবে।

কড়া ধুইয়া তাহাতে সমুদয় ঘি টুকু ঢালিয়া দাও। তিন চার মিনিট পরে ঘিয়ের ধোঁয়া উঠিতে থাকিলে এক হাতে ময়দা ঢালিতে থাক আর অন্য হাতে তাড়ু বা বড় খুন্তি দিয়া ক্রমাগত হিলাইতে বা নাড়িতে থাক। দেখ যেন তলায় লাগিয়া না যায়। প্রায় মিনিট সাত খুন্তি দিয়া নাড়িয়া ঘিয়ের সহিত ময়দা বেশ গুলিয়া গেলে পর ইহাতে আধপোয়া জল ঢালিয়া দাও। ইহার পরেই চিনি ঢালিয়া দাও। একবার নাড়িয়া দিয়া সমস্ত দুধটা ঢালিয়া দাও। এইবারে ক্রমাগত নাড়িবে। কারণ কড়ার তলায় লাগিয়া যাইবার সম্ভব। দুধ দিতে না দিতে ইহা গাঢ় থকথকে হইয়া আসিবে। দুধ দিবার মিনিট পাঁচ পরে নাড়িতে নাড়িতে যখন ঘি ভাসিয়া উঠিবে তখন, নামাইয়া একটি পাথরের উপরে ঢালিয়া সমান করিয়া দিবে। পাথরটী একটু কাত করিয়া দিবে ও তাহার নীচে একটি পাত্র রাখিবে তাহা হইলে খানিকটা ঘি চুয়াইয়া চুয়াইয়া পড়িবে।

আনুমাণিক ব্যয়।—তিনসের দুধ আট আনা, ঘি প্রায় আট আনা, খাসা ময়দা সাত পয়সা, কাশীর চিনি বার পয়সা। সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচসিকার কিছু বেশী খরচ হয়।

গুণাগুণ। ইহা অতি পুষ্টিকর খাদ্য। তিন চার দিন থাকিলেও ইহা খারাপ হয় না।

শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী।

মাছের দম্পক।

উপকরণ।—পাকা রুইমাছ একসের, তেঁতুল (বিচিশুদ্ধ) এক ছটাক, বাদাম এক তোলা, কিস্‌মিস্ আধ ছটাক, ছোট এলাচ চারিটা, লঙ্গ আটটা, দারচিনি সিকি তোলা, তেজপাতা প্রায় চল্লিশ খানা, ঘি একপোয়া, দই এক পোয়া, নুন এক তোলা, শুক্না লঙ্কা সাত আটটা, হলুদ সিকি তোলা, আদা এক তোলা, পেঁয়াজ আধপোয়া, ডেলাক্ষীর (মেওয়া বা খোয়াক্ষীর) এক কাঁচ্চা, জল আধপোয়া।

প্রণালী। আধপোয়া জলে তেঁতুল গাঢ় করিয়া গুলিয়া রাখ। মাছের কেবল মাত্র আঁশ ছাড়াইয়া বড় ডুমা ডুমা করিয়া কাটিয়া এই তেঁতুলের জলে একঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখ। বাদাম ভিজাইয়া খোসা ছাড়াও। বাদামের অর্দ্ধতোলা অংশমাত্র পিষিবার জন্য রাখ, আর বাকী অর্দ্ধতোলা কুচি করিবার জন্য রাখ। কিস্‌মিস্ ধুইয়া বাছিয়া অর্দ্ধেকটা পিষিবার জন্য রাখ। বাকী অর্দ্ধেক টুকু আস্তই রাখিয়া দাও। পেঁয়াজগুলির খোসা ছাড়াইয়া এক ছটাক পিষিবার জন্য রাখ, আর বাকী এক ছটাক কুচি করিবার জন্য রাখ। আদার খোসা ছাড়াইয়া রাখ।

আধতোলা বাদাম, আধতোলা কিস্‌মিস্. শুক্না লঙ্কা, হলুদ, আদা, এক ছটাক পেঁয়াজ সব পিষিয়া রাখ। আধতোলা বাদাম কুচি করিয়া রাখ। ভাজিবার জন্য এক ছটাক পেঁয়াজ কুচি করিয়া রাখ। তেঁতুলে ভিজান মাছ ভাল করিয়া ধুইয়া ফেল।

একটা কড়াতে এক ছটাক ঘি দিয়া চড়াইয়া দাও। পেঁয়াজ কুচি ছাড়িয়া নরম করিয়া ভাজ। তারপরে কড়া শুদ্ধ নামাইয়া রাখ। মিনিট ছয় সাতের মধ্যে ভাজা হইয়া যাইবে।

একটি হাঁড়ি আন। হাঁড়ির ভিতরে তেজপাতা গুলি বিছাইয়া দাও। তেজপাতার উপরে মাছটি রাখ; মাছের উপরে ঘি ঢালিয়া দাও। তারপরে দইয়ের সঙ্গে সমুদয় পেষা মশলা, নুন, ডেলা ক্ষীর সব একত্রে মিশাইয়া উহার উপরে ঢালিয়া দাও। তারপরে বাদাম কুচি, আস্ত কিস্‌মিস্